গাণিতিক বিস্ময়
শ্রীনিবাস রামানুজন

দেবীপ্রসাদ রায়

গণিতের ক্লাশে ব্ল্যাকবোর্ডে তিনটি কলার ছবি আঁকা আছে। শিক্ষক ভাগের ক্লাশ নিচ্ছিলেন, বললেন, তিনজন ছাত্র প্রত্যেককে ক'টা করে পাবে কেউ বলতে পারো? একটি ছাত্র তখনই হাত তুলে বললো— 'পারি স্যার, প্রত্যেকে একটি করেই পাবে। এখন এখানে ১০০০টা কলা আছে— ছাত্রও আছে ১০০০ জন। ভাগ করে দিলে ক'টি করে পাবে, প্রত্যেকে ১টা করে তাই নয় কি? এমন সময় কোণে বসে থাকা একটি ছাত্র হঠাৎ উঠে বলল, কোনও কলাও নেই, কোনও ছাত্রও নেই, তাহলেও কি একটি করে কলা পাবে প্রত্যেকে? হো-হো করে হেসে উঠলো সবাই কী বোকার মতো প্রশ্ন! শিক্ষক বললেন, 'সবাই চুপ কর। এর আগে কলা ভাগ করে দেবার জন্য আমরা ৩-কে ৩ দিয়ে ভাগ করেছি, সেইরকম ১০০০-কে ১০০০ দিয়ে ভাগ করেছি। ও যা বলছে তা হলো শূন্য সংখ্যক কলা যদি শূন্য সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকে কি একটা করে পাবে? অর্থাৎ ০/০ = ১ হবে কি? না এর উত্তর হবে অনন্ত, অর্থাৎ ০/০ = ∞। শিক্ষক মশাই ওই ছেলেটের অদ্ভুত প্রশ্নকে বাহ্‌বা দিলেন কেন, হৈ হৈ করা ছাত্ররা বুঝতেই পারল না। আসলে ছেলেটি যে প্রশ্ন করেছিল, তার উত্তর দিতে সময় লেগেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী, কেউ বলে উত্তর ০, কেউ বলে উত্তর ১। কিন্তু কোনওটিই নয়। সঠিক উত্তর পাওয়া গেল ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর, যিনি প্রমাণ করে দিলেন উত্তর হবে অনন্ত। অদ্ভুত প্রশ্ন করা এই ছেলেটি হল শ্রীনিবাস রামানুজন। ছেলেটি ছোটবেলা থেকে অদ্ভুত রকম গাণিতিক প্রতিভা দেখিয়ে সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। স্থাপত্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জেলার প্রাচীন শহর কুম্ভকোনমের এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে রামানুজন। জন্ম ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর, তার মামাবাড়ি কাবেরী নদীর তীরে এরোড নামের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। তাঁর মা নামাক্কালের দেবী নামগিরির কাছে পূজা প্রার্থনা করে তাকে পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। রামানুজনও এই দেবীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। উত্তরকালে যখন তিনি গণিত নিয়ে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, অনেক জটিল গাণিতিক সমাধান তিনি স্বপ্নে ওই দেবীর নির্দেশে পেতেন বলে বলতেন। কুম্ভকোনমের 'পিয়াল' স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি তামিল বর্ণমালা ও প্রাথমিক পাটিগণিত খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেন। আকাশে তারাদের দূরত্ব, আয়তন নিয়ে প্রশ্ন করে নাজেহাল করে ছাড়তেন শিক্ষকদের। সব সময় গণিতে ডুবে থাকা এই ছেলেটিকে নিয়ে তার বন্ধুরা খুব মজা করত। একটি অঙ্ক তাকে কষতে দিলেই সে ডুবে যেত তার মধ্যে। সেই সময় সহপাঠীরা তার ইজেরের মধ্যে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ঢুকিয়ে দিত। অঙ্কের সমাধান করে দিয়ে সে দাঁড়ালেই ঝুর ঝুর করে নুড়িগুলি পড়ত আর সঙ্গীরা মজা পেত। ছেলেটি স্কুলের নিয়মকানুনের কিছু কিছু অন্যথা করে ফেললেও শিক্ষকরা কিছু বলতেন না। কারণ প্রাথমিক স্তরে জেলার প্রথম হওয়া এই ছেলেটি তাঁদের খুব প্রিয় ছিল, তার কারণও ছিল। স্কুলে পড়ত প্রায় ১৫০০ ছেলে, শিক্ষক ছিলেন ৩০ জন। সবাইকে সন্তুষ্ট করে ক্লাশ বন্টনের রুটিন করা

এক দুরূহ কাজ ছিল। ওই ছেলেটি তার গাণিতিক প্রতিভায় অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ওই রুটিন তৈরি করে দিত। চতুর্থ শ্রেণীতে ছেলেটি ত্রিকোণমিতি শিখতে শুরু করে। প্রতিবেশী বি এ পড়া এক ছাত্রের কাছ থেকে লোনির ত্রিকোণমিতির দ্বিতীয় খণ্ড এনে শুধু পড়ে ফেলা নয়, সব অঙ্কই সে কষে ফেলেছিল। বি-এ'র ছাত্রটি প্রায়ই তার কাছ থেকে শক্ত শক্ত অঙ্কর সমাধান করে নিয়ে যেত। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই 'সাইন', 'কোসাইন' সংক্রান্ত অয়লারের (Euler) উপপাদ্যটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল নিজে নিজেই। এই সময় তার হাতে আসা জর্জ সুব্রিজকার লিখিত পুস্তক "A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics" -এর প্রভাবেই তার গণিতজ্ঞ জীবন শুরু হলো। ছোট একটি খাতায় যাকে 'নোট বুক' বলা হোত, তাতে একের পর এক উপপাদ্য উপস্থাপন করে চলত ছেলেটি— একটি নোটবই ফুরিয়ে যায় তো আর একটি। উপস্থাপিত বিষয়গুলি পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে বহু গণিতজ্ঞর অধ্যয়ন ও গবেষণার উপকরণ যুগিয়েছে।

১৯০৩ সালে রামানুজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উচ্চ স্থান পেয়ে সুব্রহ্মনিয়ম বৃত্তি পায় এবং কুম্ভকোনমের সরকারি কলেজে এফ এ পড়ার জন্য ভর্তি হয়। কিন্তু দিবারাত্র গণিত নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অন্য সব বিষয়ে অবহেলিত হতে থাকে। ফলে একাধিকবারের চেষ্টাতেও এফ এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি রামানুজন। বাবা-মা'র চরম হতাশা ও বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ে। গণিতচর্চায় কিন্তু রামানুজনের ছেদ পড়েনি। শোনা যায়, বিরক্ত বাবা-মা'র নজর এড়িয়ে খাটের তলায় গিয়ে তার 'নোট বুক' ভরিয়ে তুলত। পাশ্চাত্যের আলো ঠিকমত আসেনি তখনও— সেই সময়ের পরিমণ্ডলে তার চর্চিত বিষয়গুলি ছিল অভাবিত। বিষয়গুলি ছিল ম্যাজিকবর্গ, প্রসরমান ভগ্নাংশ (Continued fraction), হাইপার জিওমেট্রিক শ্রেণী, মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যার ধর্ম, সংখ্যার বিভাজন (Partition of numbers) ও ইলিপ্‌টিক ইন্টিগ্র্যাল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কাজগুলি হয়েছিল তার একান্ত নিজস্ব সজ্ঞায় (intution)।

চিন্তিত বাবা-মা ভাবলেন ছেলের মতিগতি ফেরাতে বিয়ে দেওয়া হোক এবং একরকম জোর করেই ৮ বছরের মেয়ে জানকীর সঙ্গে রামানুজনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। রামানুজন এবার কাজের সন্ধান করতে লাগল শুধুমাত্র জীবিকার জন্য যতটা নয়, পরন্তু তার গণিত চর্চার জন্য কাগজের প্রয়োজনে। মাসে তখন তার প্রয়োজন ছিল ২০০০-এর মতো কাগজ শিট। অভাব মেটাতে রাস্তায় রাস্তায় টুকরো কাগজও সে কুড়িয়ে বেড়িয়েছে। নীল কালিতে লেখা কাগজে বোধগম্য লেখার জন্য সে লাল কালির কলম ব্যবহার করত। কাজের সন্ধানে অফিসে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার নোটবুক দেখিয়ে বলেছে যে সে অঙ্ক জানে, কোনও কাজ দেওয়া হোক। কিন্তু বৃথাই গেছে। অবশেষে একজন মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের ডিরেক্টর ফ্রান্সিস স্প্রিং তার অঙ্কের মেধায় চমৎকৃত হয়ে ২৫ টাকা মাস মাইনের একটি কাজ দিয়েছিলেন যা ছিল একান্তভাবেই সাময়িক। তাঁর অবস্থার সমব্যথী হয়ে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথা ভেঙ্গে (কারণ তথাকথিত ডিগ্রী তাঁর ছিল না) রামানুজনের জন্য ৭৫ টাকার এক ফেলোশিপ দেয়। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার কথা অনেকের নজরে এসেছিল। তাঁদের অনুরোধে রামানুজন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ জি এইচ হার্ডিকে একটি চিঠি দিলেন। বিনীতভাবে রামানুজন জানালেন, প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর অক্ষমতার কথা, তাঁর গাণিতিক প্রাপ্তিগুলির ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিন্ত হলেও স্থানীয় গণিতজ্ঞদের পক্ষে যেগুলি স্বীকার করার অসুবিধার কথা। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তার প্রাপ্ত ১২০-র মতো উপপাদ্য ও সূত্রাবলী। এগুলির মধ্যে ছিল যাকে ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাসে রিমানিয়ান সিরিজ বলে অভিহিত করা আছে। অথচ রামানুজন এই গণিতজ্ঞ বা তার প্রাপ্তির কথা জানতেনই না। এমন কিছু সমীকরণ রামানুজন পাঠিয়েছিলেন যা আধুনিক গণিতে 'মডিউলার ইকুয়েশন' নামে পরিচিত। কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ মহল রামানুজনের গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হলেন। গণিতের আধুনিক পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারলে 'গণিত জগৎ' সমৃদ্ধ হবে রামানুজনের দ্বারা। তাঁরা তাই রামানুজনকে কেমব্রিজে আনার জন্য উদ্যোগ নিলেন। হার্ডি রামানুজন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন 'উনি একটা অসম্ভব লড়াই লড়ছেন। একা, এক নিঃসম্বল হিন্দু প্রতিযোগিতা করছেন গোটা ইউরোপের সম্মিলিত প্রজ্ঞার সঙ্গে।'

তখন ভারতের আবহবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ গিলবার্ট ওয়াকার এবং মাদ্রাজের গণিত বিষয়ক বোর্ড অফ স্টাডিজের চেয়ারম্যান। এঁদের উদ্যোগে রামানুজনকে দু বছরের জন্য বার্ষিক ৬০ পাউন্ড করে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হলো। ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো অধ্যাপক এ এইচ নেভিল 'ডিভারেন্সিয়াল জিওমেট্রি'র উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হলেন। তিনি ও মাদ্রাজ গভর্নরের উদ্যোগে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করল রামানুজনকে ১৯১৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ইংলন্ডে ব্যবহারের জন্য বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড স্টার্লিং, দু'বছরের জন্য বরাদ্দ করে। রামানুজনের বৃত্তি থেকে মাসে ৬০ টাকা বাবা-মা'র জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা হতে নিশ্চিন্ত মনে রামানুজন ইংল্যান্ড রওনা হলেন। ১৯১৪ সালের ১৭ মার্চ, ইংল্যান্ড পৌঁছলেন ৭ এপ্রিল।

৭ মে ১৯১৪, পত্রিকা 'দি হিন্দু' জানাচ্ছে— ''উচ্চতর গণিতে যার গবেষণা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে গোড়াতেই বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, মাদ্রাজের সেই এস রামানুজন এখন ট্রিনিটি

রামানুজনের বাড়ি

কলেজে রয়েছেন। মিঃ হার্ডি এবং মিঃ লিটলউড কেমব্রিজের এই দুই ফেলোর সঙ্গেই মূলত কাজ করবেন রামানুজন। ইতিমধ্যেই যে বিপুল পরিমাণ কাজ তিনি করেছেন, সেগুলির বিশ্লেষণের সময় তাঁরা বহু বিস্ময়কর তথ্য খুঁজে পাচ্ছেন।

কেমব্রিজে এসে প্রথম দু'মাস তিনি নেভিলের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। পরে ট্রিনিটি কলেজের সংলগ্ন আবাসে চলে যান। ভারতীয় সংস্কারবদ্ধ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত রামানুজন বেশ কিছু ছোটখাট অসুবিধার মধ্যে পড়লেও ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ সমাজে প্রবেশাধিকার পেয়ে বিপুল উৎসাহে তিনি কাজ শুরু করলেন। আধুনিক গবেষণার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করাতে হার্ডি প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। নিজের বিষয় সমূহের অভিজ্ঞতা নিয়ে হার্ডি রামানুজনকে ফলপ্রসূ সাহায্য দিতে পারতেন, কিন্তু রামানুজনের নিজস্ব মৌলিক পন্থা পদ্ধতিতে হার্ডি তেমন কোনও সাহায্য করতে পারতেন না।

আবার বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে অন্য গণিতবিদদের অনেকেই অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হওয়ায়, তাদের সহায়তা পাওয়াও সম্ভব হয়নি রামানুজনের। তবুও হার্ডি-রামানুজন গণিতের গবেষণায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১৪-১৫ ও ১৬ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন গবেষণাপত্রে রামানুজনের ১২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হার্ডির দৃষ্টিতে ইংল্যান্ডে আসার পর যে কাজগুলি উনি করেছেন, তার মধ্যে দীর্ঘতম এবং সংযুক্তির নিরিখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির বিষয় হল, 'অতিমাত্রায় যৌগিক সংখ্যাবলী'। অতিমাত্রায় যৌগিক বলতে সেই সংখ্যাকে বোঝায় ক্ষুদ্রতর অন্য যে কোনও সংখ্যার তুলনায় যাদের সম্ভাব্য ভাজকের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ এই ধর্মের বিচারে তারা হলো মৌলিক সংখ্যার একেবারে উল্টো ২, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৩৬, ১২০ এবং ১৮০ হল প্রথম কয়েকটি অতিমাত্রার যৌগিক সংখ্যা। অত্যন্ত সহজবোধ্য কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে কীভাবে এই জাতীয় সংখ্যার গঠন সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়, তা রামানুজন দেখালেন। হার্ডি-রামানুজন প্রদত্ত বৃহত্তম অতি যৌগিক সংখ্যার উল্লেখ করেছেন হার্ডি— ৬৭৪৬৩২৮৩৮৮৮০০ $= ২^{৬}.৩^{৪}.৫^{২}.৭^{২}$.১১.১৩.১৭.১৯.২৩।

এরপর হার্ডি মন্তব্য করেছেন— এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরও রামানুজন এই জাতীয় আরও কিছু গাণিতিক ফল নির্ণয় করেছেন। সমস্যাটি খুব অদ্ভুত ধরনের, গাণিতিক গবেষণার মূল স্রোত থেকে দূরে এর অবস্থান। কিন্তু ওঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিনবত্ব সত্যিই প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু বছরের মধ্যে ইংলন্ডে এত ভাল গবেষণাপত্র আর প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩৬ সালের শেষভাগে হার্ভার্ড টারসেন্টিনারি কনফারেন্স অফ আর্টস এন্ড সায়েন্সে দেওয়া এক বক্তৃতায় রামানুজনের 'অস্ত্র ও পদ্ধতি' বিষয়ে হার্ডি এক সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। সেখানে রামানুজনের মূল্যায়নে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে ওঁকে শেখাতে পারেন এমন কেউ তখন ছিলেন না, সর্বসাকুল্যে ৩-৪টি ইংরেজী বই তিনি দেখে থাকবেন.... ফরাসী, জার্মান ভাষায় অল্প কিছু বই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেও ওই ভাষাগুলির এক বর্ণও তিনি জানতেন না। যত কাজ রামানুজন

করেছিলেন তার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল নানা তত্ত্বের পুনরাবিষ্কার যা তাঁর জীবদ্দশায় অতি সামান্যও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'নোটবই'গুলি থেকে খুঁটিয়ে দেখে ওয়াটসন অনেক নতুন তথ্য প্রকাশ করেন। প্রথাগত গণিতজ্ঞ তিনি কখনোই ছিলেন না। কিন্তু নতুন কিছু শেখানো হলে তা তিনি আত্মস্থ করে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারতেন। রামানুজনের কাজের একটা বড় অংশই ছিল অনুমান নির্ভর। প্রমাণ বলতে কী বোঝায় তিনি বুঝলেন এবং তাই তাঁর পরের দিককার প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয়, সেগুলি কোনও বিদগ্ধ গণিতজ্ঞের লেখা, যদিও নিজস্ব মৌলিকত্ব সেখানে পরিস্ফুট থাকত। অনেকে ভেবে থাকেন রামানুজনের পক্ষে কোশির (Cauchy) উপপাদ্য খুবই উপভোগ্য। বস্তুত তিনি কখনোই কোশির শরণ নেননি। এমনকি আদৌ তার কোনও প্রয়োজন অনুভব করতেন না। অধ্যাপক লিটলউড মন্তব্য করেছেন, রামানুজন কোশির উপপাদ্য ব্যবহার করতেন না বলে 'ডাবল ইন্টিগ্র্যাল'-এর রূপান্তর (transformation) এবং ক্রমের পরিবর্তন (In version of order) নিয়ে প্রায়ই কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর সবচাইতে অস্ত্র ছিল অপসারী শ্রেণী (Divergent series) এবং ইনট্রিগ্যালের সাহায্যে ট্রান্সফরমেশনের এক অতি বিস্তারিত পদ্ধতি যা স্বাধীন ভাবে উনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। রামানুজন তাঁর নিজস্ব বোধের উপর যে নির্ভরতা দেখিয়েছেন, সম্ভবত কোনও গণিতজ্ঞই তা দেখাননি। ইলিপ্‌টিক এবং মডিউলার ফাংশানের বিশেষ ক্ষেত্রেই রামানুজন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি করেন। তাঁর বিরল উজ্জ্বল প্রতিভা এই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিল। দেখা গেছিল কল্পনা, স্বজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য সম্মিলন। অসীম রাশি নিয়ে নিয়মবদ্ধ পদ্ধতির কাজে বা বীজগণিতিক সূত্র সম্বন্ধে স্বভাবজাত অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে আয়লার (Euler), জেকবির (Jacobi) পর ওঁর সমকক্ষ আর কেউ জন্মাননি। অজস্র নতুন এবং বিস্ময়কর ফল উদ্ভাবনে ওঁর সৃষ্টির প্রবাহ ছিল বন্ধনহীন এবং একমাত্র মৃত্যুর পর তাতে ছেদ পড়েছিল— বলেছেন অধ্যাপক এল জে সরডেন যিনি রামানুজনের কাজের উপর অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ইউরোপের বিভিন্ন জার্নালে (গণিত) রামানুজনের একুশটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে হার্ডির সঙ্গে যুগ্মভাবে ছিল পাঁচটি। ১৯১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (FRS) নির্বাচিত করা হয়। অক্টোবর মাসে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। কেমব্রিজে থাকাকালীন তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ছিল সংখ্যা তত্ত্বে 'হার্ডি-রামানুজন-লিডলউড বৃত্তিয় পদ্ধতি'।

ইংল্যাণ্ডে রামানুজনের জীবনচর্যা সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকেনি। তাঁর খাদ্যাভাস, স্বপাক খাওয়া, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, গবেষণার কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে শারীরিক ভাবে মানিয়ে না নিতে পারার জন্য তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। কেমব্রিজ নার্সিং হোম সহ বারংবার বিভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে কাটিয়েও সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় তাঁকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ১৯১৯ সালের ২ এপ্রিল তিনি মাদ্রাজে এসে পৌঁছান। এখানে এলেও স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি আটকানো গেল না। মাদ্রাজে সব থেকে ভাল লভ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান ঘটল। এই অবস্থাতেও গাণিতিক চিন্তা-ভাবনার ছেদ হয়নি রামানুজনের। জানা গেল, হার্ডিকে দেওয়া এক চিঠিতে যেখানে রামানুজন লিখেছেন—

''এর মধ্যে আপনাকে একটিও চিঠি না লেখার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ... সম্প্রতি কয়েকটি মজার ফাংশান আবিষ্কার করেছি। নাম দিয়েছি 'মক থিটা ফাংশান (Mock θ function)। অধ্যাপক রজার্স ফল্‌স θ (Fassc θ) ফাংশান নিয়ে আংশিক কাজ করেছিলেন— এগুলি তার মত নয়, আর পাঁচটা সাধারণ ফাংশানের মতোই স্বাভাবিকভাবে এগুলি গণিত শাস্ত্রে প্রয়োগ করে নেবে। চিঠির সঙ্গে আমি এর কিছু উদাহরণ পাঠালাম...।''

কোনও প্রতিভাধরের অসমাপ্ত কাজ যখন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ সশ্রদ্ধ আগ্রহে হাতে তুলে নেয়, তখনই তাঁকে সব থেকে বড় সম্মান জানানো হয়। গাণিতিক, গবেষণার জগতে রামানুজন এমনই নবদিগন্ত খুলে দিতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ ষোল বছর একটানা লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট থাকার পর ১৯৩৬ সালের ১৪ নভেম্বর অধ্যাপক ওয়াটসন বিদায় ভাষণ শেষ করলেন রামানুজনের জন্য আর একটি মূল্যায়ন রেখে গিয়ে— ''...মক থিটা ফাংশানের আবিষ্কার দেখে বোঝা যায় যে অকাল মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর অন্য যে কোনও আবিষ্কারের মতোই। শুধু এই মক থিটা ফাংশানের জন্যও রামানুজনের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারত।''

রামানুজনের ১২৫তম জন্মবর্ষ ২০১২ সালে জাতীয় গণিত বর্ষ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন। এই জাতীয় গণিতবর্ষে আমাদের সঙ্গত ভাবনা ভারতে বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণকারী আর কোনও গণিতজ্ঞকে আমরা পাচ্ছি না কেন? উনবিংশ শতাব্দীতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিত বিদ্যার মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। হয়ত অত্যুক্তি, তবুও অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ মনে করতেন ভাস্করাচার্যের পর মৌলিক অবদানের জগতে ভারতীয় হিসেবে আশুতোষই উল্লেখ্য। সম্ভবত রামানুজনের কথা ব্যাপকভাবে জ্ঞাত ছিল না তখন। যাই হোক, অন্যান্য বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে আশুতোষের প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছিল। পরবর্তী কালে উপাচার্য আশুতোষের বাছাই করে আনা সত্যেন্দ্রনাথ বসু যিনি একান্ত ভাবে বিশেষ সংখ্যায়ন উদ্ভব করে সমকালীন পদার্থবিদ্যার জগতে কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণে

শক্তি বন্টন সমস্যার সমাধান করেছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে এবং প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার অসাধারণ দৃষ্টান্ত হল আইনস্টাইন লব্ধ ৬৪টি সমীকরণের সমাধান করা। আইনস্টাইন একীকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে ৬৪টি সমীকরণ পেয়েছিলেন গাণিতিক প্রয়োজনে যাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষার শর্ত ছিল কতকগুলি অভেদ (Identity) —যাদের সামঞ্জস্য ওই ৬৪টি সমীকরণের সমাধান পাওয়া যাবে। এটি কিছুদিন একটি দুরূহ সমস্যা বলেই পরিগণিত হতো। বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞ পদার্থবিদ নোবেল জয়ী শ্রোয়েডিগোরকে বলতে হয়েছিল, "...it is next to impossible ... this is hard to believe, unless one has trocd". (Proceeding of the Royal Irish Academy, Vol. 51, P-166, 1947)। সত্যেন্দ্রনাথ বসু উক্ত অভেদগুলি পেলেন গণিতজ্ঞ হিলবার্ট (Hilbert) -কে অনুসরণ করে এবং পাঁচটি গাণিতিক প্রবন্ধ মারফৎ ওই সমীকরণগুলির সমাধান বিজ্ঞাপিত করেন। একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল "Annals of Mathematics" -এ ইংরাজীতে।

অপর চারটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল ফ্রান্সের জার্নালে। আইনস্টাইন গাণিতিক সুষমামণ্ডিত ওই সমাধানগুলির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক গাণিতিক মৌল চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড গ্রস কিছুকাল আগে ভারতে এসে আক্ষেপ করে গেছেন, ভারতের মতো দেশে যেখানে একদা 'শূন্য'র মতো বিস্ময়কর ধারণা জন্ম নিয়েছিল, যেখানে বিশ্বমানের গণিতজ্ঞ আর দেখা যাচ্ছে না কেন? কয়েকবছর আগে ইনফোসিস-এর তরফে গণিতে অসামান্য অবদানের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল 'ভারতীয় গণিতবিদ'দের জন্য। ২০০৮ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন আই আই টি কানপুরের মণীন্দ্র অগ্রবাল, ২০০৯ সালে পেয়েছিলেন এলাহাবাদের হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইন্সটিটিউটের অশোক সেন। ২০১০, ২০১১ সালের জন্য কোনও ভারতীয় পাননি। পেয়েছেন জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্রশেখর খারে, এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কান্নন সুন্দররাজন। আজ ২০১২, কোনও ভারতীয়কে এই জাতীয় গণিত বর্ষে উপযুক্ত গণিতজ্ঞ হিসেবে পাওয়া গেল না পুরস্কারের জন্য। গণিতে গবেষণাপত্র প্রকাশের নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান চতুর্দশ, দক্ষিণ কোরিয়ারও পিছনে। বিপুল অর্থের চাকরির লোভে মেধাবী ছাত্ররা তথ্যপ্রযুক্তির দিকে চলে যাচ্ছে। প্রতিকার হিসেবে শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগই গবেষণাতে মেধাবীদের টেনে আনা যাবে না। প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষানীতির। এদিকটাই গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা দরকার। অর্থের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে গবেষণার দিকে আসার প্রবণতা হচ্ছে না কেন আগের মতো? শিক্ষানীতি নিয়ামকরা কি ভাবেন? আমরা অভিভাবকরাও সন্তান সন্ততি ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণামুখী করতে পারছি না কেন, ভাববো কি? রামানুজন স্মরণে জাতীয় গণিত বর্ষ পালন এই প্রশ্নগুলির সামনে এনে দিয়েছে আমাদের।

“ কোনও প্রতিভাধরের অসমাপ্ত কাজ যখন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ সশ্রদ্ধ আগ্রহে হাতে তুলে নেয়, তখনই তাঁকে সব থেকে বড় সম্মান জানানো হয়। গাণিতিক, গবেষণার জগতে রামানুজন এমনই নবদিগন্ত খুলে দিতে পেরেছিলেন। ”

রাষ্ট্র পরিচালনায় খড়ের মানুষের উপদ্রব

ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিরোনাম দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন কেন ‘খড়ের মানুষ’ কথাটি চয়ন করেছি। কথাটি আমার নয়, শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ রাজনীতিবিদ চার্চিল সাহেবের। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মান ও চরিত্র নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমস কাগজের প্রথম পাতায় ‘শিরোনামে’ (২৯ জুলাই, ২০১২) প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী কলকাতায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাজ্য রাজনীতির কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে তিনটি বিষয় জরুরি— রাজনীতির কারবারিদের নিম্নমানের হতে হবে, অর্থাৎ বোধশক্তি ও প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন হলে চলবে না; আর তাদের ‘চামচা’ তথা ক্রীড়নক হতে হবে অর্থাৎ সব কিছুই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে; এছাড়া তাদের দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক— কেননা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে অথবা শিথিল চরিত্রের মানুষ কখনোই মাথা উঁচু করে চলতে পারবে না। এগুলি না থাকলে কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে। কোনও প্রতিবাদ চলবে না। কলকাতাকে লণ্ডন বানাবার জন্য যে ত্রিফলা আলোর ব্যাপক আয়োজন চলছে, তাকে সাধুবাদ জানাতে হবে। নিয়মবিধি না মানা হলেও টুঁ শব্দ করা চলবে না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক নেতাজী সুভাষ বলেছিলেন, রাজনীতিবিদদের ভালো ছাত্র হওয়া প্রয়োজন, আর তাদের নৈতিক মান উন্নত হতে হবে। জ্ঞানসম্পন্ন না হলে দেশের উন্নতি কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকবে না, আর নৈতিক মান না থাকলে কাজকর্ম রূপায়ণে সঠিক নজরদারি সম্ভব নয়।

এবছর আগস্ট মাসে স্বাধীন ভারতের বয়ঃসীমা ৬৫ অতিক্রান্ত হলো, আর প্রজাতন্ত্র বাষট্টি পেরিয়েছে জানুয়ারি মাসে। ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি পদে ইউ পি এ সরকারের ‘চাণক্য’ নাম পরিচিত প্রণব মুখোপাধ্যায় অভিষিক্ত হয়েছেন গত ২৫ জুলাই। জাতীয় কংগ্রেস (নব সংস্করণ) ব্যতীত ডি এম কে, সমাজবাদী পার্টি, বি এস পি, আর জে ডি, তৃণমূল কংগ্রেস ও সি পি এম প্রমুখ একযোগে ইউ পি এ প্রার্থীকে সমর্থন করেছে। প্রথম চারটি দল বিভিন্ন দুর্নীতির জালে নিমগ্ন, তাই তাদের রক্ষাকবচ চাই। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস ও সি পি এম দলীয় দায়বদ্ধতার চাপে প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রণববাবুর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। তৃণমূলের অঙ্ক কেন্দ্রীয় অনুদান, সি পি এমের অঙ্ক কংগ্রেস বিরোধিতা থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে সমর্থনের আবর্তে ফিরে এসেছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কি শোচনীয় পরিণতি! জনগণতন্ত্রের জঙ্গী নেতা সুশান্ত ঘোষ, লক্ষণ শেঠ জেল ফেরত। স্বাধীনতার আগে বিপ্লবীরা জেলে যেতেন মুক্তি সংগ্রামের সেনানী রূপে। আর নৃশংস দলীয় তাণ্ডবের কারিগররা এখন জামিনে মুক্ত। প্রণব মুখার্জী পুরস্কার পেলেন পরিবারতন্ত্রী কংগ্রেসের বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ পর্যন্ত প্রণববাবু যে সেবাধর্মের নজির রেখেছেন তা অতুলনীয়। ভাগ্য ভাল ইন্দিরার পৌত্রের সেবাদাস হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ-এর বাংলার ঐতিহ্য ও গরিমা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। নেতাজী ডাক দিয়েছিলেন ‘দিল্লি চলো’। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের শেষ পরিণতি এখনও রহস্যাবৃত। আর ক্ষমতার রাজনীতির কুশল কারিগর প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রের প্রধানতম পদে আসীন। দিল্লি রাইসিনা হিলস্-এর প্রাসাদের বাসিন্দা।

দ্বিতীয় যে ঘটনা সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে তা হলো, রাহুল গান্ধী দল ও সরকারে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান শাসক দল প্রায় চার দশক ধরে একটি পরিবারের পরিমণ্ডলে ঘুরপাক খাচ্ছে। ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া থেকে সঞ্জয় গান্ধী হয়ে রাজীব গান্ধী মসনদে বসেন। কিছুকাল বিরতির পর ১৯৯৮ থেকে চৌদ্দ বছর কংগ্রেস সভানেত্রী রাজীব-পত্নী সোনিয়া কংগ্রেস রাজনীতির অন্তরাত্মা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর একটানা চৌদ্দ বছর কেউ সভাপতিত্ব করেননি। গান্ধীজী, প্যাটেল, নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আজাদ, দেশবন্ধু, সুভাষ বসু কেউই সোনিয়া গান্ধীর রেকর্ডের ধারে কাছে যেতে পারেননি।

আর রাষ্ট্রপরিচালনায় এখনকার কংগ্রেস দলের রেকর্ড কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। লাগামছাড়া দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অর্থনৈতিক সঙ্কট সব দিক থেকে কংগ্রেস রাষ্ট্র পরিচালনার যে নজির স্থাপন করেছে তা এক কথায় অতুলনীয়। শোনা যাচ্ছে, দুর্নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস ও এন সি পি দুই শরিক দলের মধ্যে টাগ অফ ওয়্যার চলছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যর্থতার সুবাদে জাত-পাত, ধর্ম, আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাষ্পে জাতীয় জীবন এখন ক্লেদাক্ত।

আমরা আশা করেছিলাম জাতীয় মুক্তি সম্পন্ন হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন পাবে, কর্মে ও ধর্মে মহান হবে। আসলে এখন ভারতের অস্তিত্বের সংকট বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতে ভারতীয়করণের ঝোঁক তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। মূঢ় মূক ভারতবাসীর জীবনে অন্ধকারের অমানিশা আর মুষ্টিমেয় ইণ্ডিয়ানদের এখন তর্জন গর্জন, তারা বুঝি অরাজকতার ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। কিন্তু কেন এমন হল?

ভারতের রাজনীতিবিদরা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। তাতে সন্দেহের কারণ দেখছি না। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্তে বৃটিশ রাজনীতিবিদ উইনস্টন চার্চিল যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। স্বাধীনতা লাভের পর দু'দশক কাল পরিস্থিতি তেমন অবনতি ঘটেনি। বরং গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণে আমরা কিছুটা সফল হয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরু আর পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুযোগ্য ইতিবাচক নেতৃত্ব ভারত ও অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে স্থিতিশীলতা ও বিকাশের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর? চার্চিলের ভাষায় 'শয়তান পাষণ্ড ও নীচু মানের' রাজনীতিবিদদের হাতে ভারতের অবস্থা নাজেহাল হয়ে পড়বে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রথম থেকে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নৈতিক অবনমন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন, "The Congress is simply fading away before our eyes. Even a fading might have been tolerated, but something worse is happening"। কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জাতপাতের লড়াই আর দুর্নীতি প্রবণতা সম্পর্কে নেহরু বারবার কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাঁর নজর এড়ায়নি। তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, কিভাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্বকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চাপে জেরবার হতে হয়েছিল।

এখনকার রাজনীতির দিকে চোখ বোলালে দেখা যায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়ন কিভাবে রাজনীতির আঙিনাকে কলুষিত করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দম্ভ ও আত্মম্ভারিতা। ১৯৩৭ সালে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধে নেহরু খোলাখুলি লিখেছেন যে জনপ্রিয়তা ও চাটুকারিতা রাজনীতিবিদদের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা জনমোহিনী নেতাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

জাতি প্রতিষ্ঠার পথ ও পন্থা :

ভারতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা পাশ্চাত্য মডেলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাতি নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সকলেই ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র তথা নেশন যান্ত্রিক ও অমানবিক। বঙ্কিমের ভাষায় পৈশাচিক। তাঁরা কেউই জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। পরানুকরণ স্তাবকতা ও ভিক্ষাবৃত্তি যে আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে তাতে তাঁরা সহমত পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে ভারতবাসীকে পদলেহী কুকুরের রাজনীতি ত্যাগ করে বৃষসুলভ রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন।

স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ধর্মকেই 'জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ' বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, দুর্বলতাই পাপ। উপনিষদের অভীঃমন্ত্রের ভিত্তিতেই জাতীয় জীবনের উজ্জীবন সম্ভব।

> **"স্বাধীনতার পর দলতন্ত্রের মুখোশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সামাজিক ন্যায় বিচারের নামে যে বহুত্ববাদের স্ফীতি ঘটেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু তোষণের যেরকম বাড়বাড়ন্ত, তার ফলে ভারতের সমাজ জীবনের সহজাত বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের ঢাকঢোল বাজিয়ে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বনিয়াদ রচিত হয়েছে, তা আসলে রাজনৈতিক দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।"**

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপকে নকল দেশপ্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী রচিত 'রায়তের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় যা লিখেছেন, আজ আমরা তা হাড়ে হাড়ে দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''একদিন ইংরেজদের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স নিয়ে পার্লামেন্টের রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলাম।' কংগ্রেস রাজনীতি এই খেলাই খেলছে। কখনও একক শক্তিতে আর কখনও জোট বেঁধে। যে কোনও মূল্যে ক্ষমতার অলিন্দে থাকতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, ''ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজম্ ফ্যাসিজম প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকার প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন। এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। বুঝতে পারছি ১৯৭০-এর দশক থেকে কংগ্রেস দলের কেরামতি, জরুরি অবস্থার বেয়াদপি আর পরিবারতন্ত্রের আস্ফালন কেন প্রকট হয়ে উঠেছে। আর রাজ্য রাজনীতিতে হার্মাদ, জল্লাদ, উন্মাদ সবেরই অভিনয় জমে উঠেছে। পেশী শক্তির তর্জন গর্জন ও প্রমোটার রাজের শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি শপিং মল-এর আড়ম্বর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দলসর্বস্ব অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি সুষ্ঠু সহজাত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করছে।

তাহলে পরিত্রাণের পথ কোথায়? পেশাদারী রাজনীতির বনবেড়ালদের সংযত করা ভিন্ন আর কোনও পথ নেই। এর জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান প্রয়োজন। এখন গণতন্ত্রের মুখোশে রাষ্ট্র ও পেশাদারি নিম্নমানের নৈতিক নেতা-নেত্রীরা সমাজের অভিভাবক হয়ে উঠেছেন। তাই তো দেখি, গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত দখলের জন্য এতটা টাগ অফ ওয়্যার। সি পি এম আমলে পশ্চিমবঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভোটের নামে প্রহসন চলত। কি যাদুমন্ত্রে সি পি এম প্রার্থীরা ৯৮ শতাংশ ভোট পেত, তার কি ব্যাখ্যা প্রয়োজন! রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী স্বরাজ প্রভৃতি লেখায় আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় সমাজের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত স্বরাজ সাধনা নিছক চরকায় সূতা কাটার সাধনা নয়, চিত্তহীনতা নয়, তার ভিত্তি লোকহিত ও সমাজের বিকাশ।

সমাজের উপর রাজনীতির আধিপত্য নয়, রাষ্ট্রের উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ ভারতকে যুগ যুগ ধরে সঞ্জীবিত করেছে। তাই দেখি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পালাবদল ঘটলেও সমাজের স্বয়ংক্রিয় চরিত্র অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজ প্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্রই ব্যাপ্ত হতে থাকে। রাষ্ট্র প্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে।' কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারত আত্মরক্ষা করেছে কারণ এখানে 'সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।'

স্বাধীনতার পর দলতন্ত্রের মুখোশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সামাজিক ন্যায় বিচারের নামে যে বহুত্ববাদের স্ফীতি ঘটেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু তোষণের যেরকম বাড়বাড়ন্ত, তার ফলে ভারতের সমাজ জীবনের সহজাত বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের ঢাকঢোল বাজিয়ে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বনিয়াদ রচিত হয়েছে, তা আসলে রাজনৈতিক দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম জীবনে গত তিন দশক ধরে পেশাদারী রাজনীতিবিদদের পেশীশক্তির আস্ফালন চলছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের বুলি কপচাবো আর হানাদারদের মতো আচরণ করব তা সত্যিই হাস্যকর। প্রতিবাদী জনতার জাগ্রত বিবেক দেশ ও সমাজের একমাত্র মুশকিল আসান।

With Best Compliments From :-

SKIPPER LIMITED

Manufacturer of Steel Pipes, Swaged Type Poles, Scaffolding Ground Based & Roof Top Telecom Towers and Transmission Line Towers

CERTIFICATION INTERNATIONAL
ISO 9001:2000
Cert No: CI/10916
UKAS QUALITY MANAGEMENT
063

OPERATOR

Horizontal Directional Drilling Machine for under ground Cable and Pipe Lying Using Trench less Technology

REGISTERED OFFICE

3A, Loudon Steet, 1st Floor, Kolkata - 700 017
Phone No. 2289-2327/5731/32, Fax No. 2289 5733
mail@skipperlimited.com, www.skipperlimited.com

FACTORY

Jangalpur Unit :
Jalan Complex (Gate No. 1)
N.H. No. 6, Vill - Jangalpur
P.O. Andul Mourim Howrah - 711 302
Phone : 033-2669 1251 / 52
(BCTL) 2669 4563 / 64
Fax : 033 2669 2328, (BCTL) 2669 5199

FACTORY

Uluberia Unit :
N. H. No. 6, Vill - Madhabpur
P.O. Mahishrekha,
P.O. Uluberia
Howrah - 711 303
Phone : 033 2621 0826 / 0827
Fax : 033 2621 0824

উপন্যাস

অতলান্ত

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

একটু আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আকাশের মুখ এখনও ভার-ভার।

বৃষ্টি এলেও জানালাটা খোলাই রেখেছিল কাবেরী। ক'দিন ধরে বড্ড গরম যাচ্ছে। বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়াটা মন্দ লাগছিল না। তাছাড়া দুপুরের ঘুমের মধ্যেই বৃষ্টি এল। উঠে জানালা বন্ধ করতেও আলস্য হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে এখন আবছা অন্ধকার। দেওয়াল ঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আলগা একটা হাই তুলে বালিশের তলা থেকে মোবাইল সেটটা বার করল কাবেরী। বোতাম টিপে সময় দেখল। সর্বনাশ! পাঁচটা চল্লিশ! ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল কাবেরী।

বাতি জ্বালিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেঝেটা এখনও ভিজে আছে। তার মানে, বৃষ্টির ছাঁট ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর নেই। আকাশে ছাড়া-ছাড়া মেঘ, আর কেমন গুমোট।

জানালা থেকে সরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল কাবেরী। চিরুণি তুলে চুলটা একটু আঁচড়াল। চোখ সরু করে নিজের মুখটা একটু দেখল। সাতচল্লিশ চলছে, দুই ছেলে-মেয়ের মা। দুটোই সিজার-বেবি। তবুও পেটের কাছে চর্বি জমতে দেয়নি কাবেরী। নিয়মিত যোগাসন করে। তেল-মশলা, ভাজাভুজি খায় না। ফলে তার শরীর এখনও অনেকটাই ছিপছিপে। মুখটা অবশ্য সামান্য ভারী হয়ে এসেছে। নাকের দু-পাশে দুটো ভাঁজের রেখা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট। গায়ের রং পশ্চিমবাংলায় এসে একটু যেন পরিষ্কারই হয়েছে। ওড়িশায় থাকতে বরং খানিকটা জ্বলাই ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কাবেরীর দাঁতের পাটি দেখতে ইচ্ছে হয়। আজও এই মুহূর্তে, দাঁত দেখল কাবেরী। ডেনটিস্টের কাছে নিয়মিত দাঁত স্ক্র্যাপ করায় সে। নিজের মনেই একটু হাসির ভাব করল। ঝল্‌সে উঠল সাদা দাঁত। ঝক্‌মক্ করছে।

কিন্তু তারপর?

ধড়মড় করে বিছানায় কেন উঠে বসল কাবেরী?

কি এমন রাজকার্য বাকি রয়েছে যে করতে হবে?

যতদিন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন, তবুও একটা নিয়মিত দায় ছিল। দায়টা অবশ্য নিজেই ঘাড় পেতে নিয়েছিল কাবেরী। নয়তো, সঞ্জীব অনেকবারই বলেছিল— 'নার্স রাখো। দরকার কি রুগী ঘাঁটাঘাঁটি করার?'

শেষপর্যন্ত দিনের জন্য নার্স রাখা হলেও রাত্রের জন্য নার্স রাখতে দেয়নি কাবেরী। বলেছিল— 'ফালতু টাকা নষ্ট। কাজ তো তেমন কিছুই নেই। বসে বসে ঘুমোবে। রাতের লাস্ট ওষুধ সাড়ে দশটায়। আমিই খাইয়ে দিতে পারব।'

সঞ্জীব একটু বক্র হাসি হেসে বলেছিল— 'তুমি হচ্ছ ওয়ান-পাইস ফাদার-মাদার।'

তা বলে শাশুড়ির সঙ্গে বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল না কাবেরীর। কোন বউয়ের সঙ্গেই বা থাকে? তার ওপর মহিলা ছিলেন অসম্ভব জেদী। যা ঠিক করবেন, করবেনই। কারও বারণ শুনবেন না। এছাড়াও ভীষণই খুঁতখুঁতে। কাবেরীর কোনও কাজই তাঁর পছন্দ নয়। এই পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে পঁচিশটা কাজেরও প্রশংসা করেননি। ফোন করে করে দিল্লিতে মেয়ে শুভার কাছে বউমার কু গেয়েছেন। সুতরাং এ হেন একজনের জন্য গতর খাটানোর তেমন কোনও কারণ ছিল না কাবেরীর।

টাইলস্ বসানো বাথরুমের মেঝে এত ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হয় না। সঞ্জীব অনেকবার বারণ করেছে মাকে। শোনেননি। সর্বত্র দাগ আর ময়লা দেখে বেড়াচ্ছেন উনি। অথচ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে রোজ দুবেলা বাড়ি সাফ করছে কাবেরী। পাশে মেন রোড। অনবরত গাড়ি যাতায়াত করছে। ধুলোর প্রকোপটা একটু বেশি। শাশুড়ির কিছুই পছন্দ হত না। রোজ রোজ বাড়ি জল দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করতে হবে।

ধুত্তেরি! যত পাগলের প্রলাপ। আগে কথা কাটাকাটি হত। পরে দশটা কথা বললে একটা জবাব দিত। তাও কাঠকাঠ মুখে। শেষ দিকটায় সঞ্জীবের সঙ্গেও মায়ের খটাখটি লেগেছিল। তার জন্য অবশ্য কাবেরী দায়ী নয়। কারণটা অন্য। তবুও ছেলের কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে শাশুড়ির যখন কাঁচুমাচু অবস্থা, তখন কাবেরীই জোর করে প্রায় ঠেলে মায়ের ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল ছেলেকে। রাগে তখনও ফোঁস ফোঁস করছিল সঞ্জীব। বলছিল— 'তুমি বাধা দিলে তাই। নয়তো আজই ব্যাঙ্কের পাশবুক, চেকবুক সব কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম।'

কাবেরীই তখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলেছিল— 'ওসব কাজের জিনিস। ছিঁড়ে ফেলাটা কোনও কাজের কথা নয়।'

বাথরুম অকারণে সাফ করতে গিয়ে পা হড়কে কোমরের হাড় ভাঙল শাশুড়ির। এক বছর শয্যাগত। সঞ্জীব বিরক্ত হয়ে বলেছে— 'যেমন কর্ম, তেমন ফল। নার্স রেখে দাও।'

কাবেরীই রাতের নার্স রাখতে দেয়নি। সঞ্জীব বলেছে— 'তুমি যদি চাকরি করতে?' কাবেরী বলেছে— 'চাকরি তো আর করি না। ধরে নাও এটাই আমার চাকরি।' সঞ্জীব বক্র হাসি হেসে বলেছে— 'কি কথা!'

কাবেরী কথা বাড়ায়নি। অসহায় মানুষের ওপর রাগ পুষে রাখতে নেই। হয়তো সঞ্জীবের কথাই ঠিক— যেমন কর্ম, তেমন ফল। অনেক অন্যায় করেছেন, বলেছেন, তারই প্রতিফল। তবুও রাগ পুষে রাখেনি কাবেরী। কখনও কোনও অন্যায় কি সে-ও করে না বা করেনি? মানুষ নিজের অন্যায় দেখতে পায় না। কোনওদিন কখনও সেও হয়তো প্রতিফল

পাবে।

বিশাল খাটে একা পড়ে থাকা মানুষটাকে দেখে মায়াই হত তখন কাবেরীর। শ্বশুর চলে গেছেন সেই কবে। মেয়ে-জামাই দিল্লিতে। যতই ফোনাফুনি করুক, এসে দায়িত্ব নেবার পাত্র নয়। বিশাল খাটে দু-পাশে নাতি-নাতনীকে নিয়ে শুতেন। আজ তারাও কত দূরে! ফোনে এক আধবার ঠাম্মির খোঁজ করে কি না করে। অথচ ভাঙা হাড়ের যন্ত্রণায় মাঝেমাঝেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠত মানুষটা। নার্সের কাছ থেকে ব্যথা কমিয়ে ঘুম পাড়ানোর ইঞ্জেকশান দেওয়ার তরিকা শিখে নিয়েছিল কাবেরী। ইঞ্জেকশান দিয়ে দিত। সঞ্জীব টিপ্পনি কাটত— 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।' কখনও বলত— 'অহিংসা পরমো ধর্ম!' কাবেরী কিছু বলত না।

তা বলে ক্লান্ত কি লাগেনি? লেগেছে। বিরক্তি? তাও হয়েছে বইকি! দিল্লি থেকে ননদ শুভা ফোন করে বলত— 'এসব পেসেন্টের কোনও ঠিক নেই, বউদি। ছ-মাসও টিকতে পারে, আবার দু-বছরও। দাদা ঠিকই বলে। তুমি কদ্দিন বেগার খাটবে? বেড-সোর-টোর হয়নি তো? দেখো বাবা! তাহলেই কেলেঙ্কারি।'

ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে পাউডার লাগাত কাবেরী। সমস্ত শরীরটাকে নেড়ে-ঘেঁটে দেখত। তবুও বেড-সোর ঠেকাতে পারেনি। দুর্গন্ধ! বমি আসত মাঝেমাঝে। ক্লান্ত, ক্লান্ত লাগত। এখনও ক্লান্তই লাগে কাবেরীর। তখন ছিল কাজ করার ক্লান্তি। এখন ক্লান্তি কাজ না থাকার।

হাতে অঢেল সময়, তাই মাঝে মাঝে এখন নিজের এই সাতচল্লিশ বছরের জীবনটাকে উল্টে-পাল্টে দেখে কাবেরী। মাত্র বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে করে কি যে ভুলই করেছিল! এমন তো নয় যে লাভ-ম্যারেজ। সেটা যে হবার নয় জানত কাবেরী। নেহাতই চার-পাঁচটা সম্বন্ধ করে ঠিক হওয়া মামুলি বিয়ে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাপ্পা, তিনবছর পর সৌমি। অতঃপর সংসার আর সংসার, কাজের কোন শেষ নেই। অথচ এখন? হাতে কোনও কাজই নেই।

কিন্তু কাবেরী ভালোই জানে, তার ছোটবেলার বন্ধুদের অনেকেই চাকরি করে। হেঁজিপেঁজি নয়, বেশ ভালোই চাকরি। সময় কাটাতে এখন ফেসবুক খুলেছে কাবেরী। সেখানেই পুরনো বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ফোনেও কারও কারও সঙ্গে কথাবার্তা, মেসেজ চালাচালি হয়। ভালোই লাগে। তবুও কোথাও কি একটা কাঁটা মনের মধ্যে রক্ত ঝরায় না? ওরা সবাই কাজ করে, সংসারের চার দেওয়ালের বাইরে ওদের একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। শর্মিলা ব্যাঙ্কের অফিসার, মধুমন্তী ডাক্তার, স্কুলে কাবেরীর বেস্ট ফ্রেন্ড মারাঠি মেয়ে হেমলতা তো বিখ্যাত গাইনি সার্জেন। শুধু হিল্লি-দিল্লি নয়, ফরেনও চযে বেড়ায়।

ফিসফিস করে নিজের নামটা দু-তিনবার উচ্চারণ করল সে। .... কাবেরী... কাবেরী.... কাবেরী। কেউ কি মনে রেখেছে তার ভালো নামটা? ব্যাঙ্কের পাস-বুক, চেকবুকে আছে অবশ্য। বাড়ির দলিলে আছে। এরকম আরও কিছু কেজো দলিল দস্তাবেজে। এরকম আরও কিছু কোনও দলিল-দস্তাবেজে। সঞ্জীবের নামের সঙ্গে জুড়ে। একবার ব্যাঙ্কে একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলতে চেয়েছিল কাবেরী। সঞ্জীব পাত্তাই দেয়নি। বলেছিল— 'তোমার নামে তো একটা আলাদা এ টি এম কার্ড আছে। যখন ইচ্ছে টাকা তোলো না, কে বারণ করেছে? ফালতু আরও অ্যাকাউন্ট খোলার কি দরকার?' 'ফালতু' শব্দটা কানে এসে বিঁধেছিল কাবেরীর। আর কথা বাড়ায়নি।

বিছানায় রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল টুংটাং। ব্যাঙ্গালোর থেকে মেয়ে সৌমি মিসড্ কল্ পাঠাল নাকি? খাপ থেকে খুলে চশমাটা চোখে লাগাল কাবেরী। ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ। এখন চশমা ছাড়া কাছের লেখা পড়া যায় না। নাঃ, মিসড্ কল্ নয়, একটা মেসেজ। সোহিনির। ও এন-জি-ও করে। এদের কাজ-টাজগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। বেশ কয়েকটা সোস্যাল হোম চালায়। কোনওটা বৃদ্ধাশ্রম, কোনওটায় থাকে বাপ-মা-হারা অনাথ পথশিশুরা। গত পঁচিশে বৈশাখ এইসব পথশিশুদের দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটক করিয়েছে রবীন্দ্র সদনে। কাবেরীকে যেতে বলেছিল। যাওয়া অবশ্য হয়নি। সেদিনই সারাটা দিন গাড়িটা সঞ্জীবের কব্জায়। এই উত্তরপাড়া থেকে ট্রেনে-বাসে যেতে ভরসা পায় না কাবেরী। সে একটু মুখচোরা আছে।

মেসেজটা পড়ল কাবেরী— 'কি রে, রিংকা, কি করছিস?' রিং কি, রিংকা এই নামেই তাকে ডাকে সবাই। সোহিনি ওড়িশায় তার ছোটবেলার বন্ধু। সে তো এই নামে ডাকবেই। পাড়াতে যারা একটু ছোট, তারা ডাকে রিংকিদি, কিংবা রিংকি বউদি। বাপ্পা-সৌমির বন্ধুরা ডাকে 'আন্টি'। কয়েকজন অবশ্য একটু পুরনো চালে কাকিমা বলেও ডাকে। ব্যস! ওই পর্যন্তই! কাবেরী নেই, কোথাওই নেই।

দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল কাবেরী। মে মাসের প্রায় শেষ। ক'দিন ধরে প্রচণ্ড গরম চলছিল। গতকালের কালবৈশাখীর পর একটু উনিশ-বিশ হয়েছে। ডাকদিকে, সামান্য দূরে জি টি রোড। তর্জন গর্জন করে ট্রাফিক চলেছে। ডাইনে ঘুরে জি টি রোড ধরে দু-তিন মিনিট হাঁটলেই বালিখাল। তারপর সেতু। ওপারে দক্ষিণেশ্বর।

বাড়িটা সেকেণ্ডহ্যান্ড। তবে খুব পুরনো নয়। ধাঁচটা অবশ্য একটু পুরনো। নিচে দুটো ঘর, দোতলায় দুটো। ছাদের সিঁড়ি আছে। একতলায় একফালি উঠোন। পার হয় কিচেন, বাথরুম। শেষেরটা একটা ছিল। পাশে ছিল একটা ঘুপচি ঘর। কাবেরীর কথায় অবশ্য সেই ঘরটাতে টাইলস্, শাওয়ার বসিয়ে

ছোট্ট আরেকটা বাথরুম করে দিয়েছে সঞ্জীব। এবাড়িতে দুটি জিনিস কাবেরীর খুব প্রিয়। এই বাথরুম, আর এই ছাদ। বিয়ের পর প্রথম দশটা বছর ভাড়াবাড়িতে কেটেছে কাবেরীর। উত্তরপাড়া বাজারের কাছে ঘিঞ্জি জায়গায় দোতলা বাড়ির একতলায়। দোতলায় অন্য ভাড়াটে। যেখানে আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনভর ঝগড়া। বাপ্পা, সৌমি তো ওখানেই বড় হচ্ছিল। কিন্তু বিরক্তিকর পরিবেশ। আশপাশে বাজার, বস্তি। মাথার ওপরে ঝগড়া।

কিন্তু শাশুড়িকে দেখেছে কাবেরী, নির্বিকার। উনি তাতেই অভ্যস্ত। বলতেন— 'পঞ্চাশ বছরের ভাড়াটে আমরা। পঞ্চাশ টাকা মাত্র ভাড়া। ছাড়া যায়?'

কাবেরীর অসহ্য লাগত। সে ওড়িশার সুন্দরগড় শহরে খোলামেলা জায়গায় বড় হয়েছে। আরও অসহ্য লাগল যেদিন দোতলার ঝগড়ুটে স্বামী-স্ত্রীর ছেলে আর বউমা, ওরা সঞ্জীব-কাবেরীরই সমবয়সী। দিব্যি এবাড়ি ছেড়ে বনহুগলীতে নিজেদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে চলে গেছে। বউটা সরকারি চাকরি করত। ওর নামেই নাকি ব্যাঙ্ক থেকে ফ্ল্যাট কেনার লোন নিয়েছে। নিজেকে সেদিন খুব অসহায় মনে হয়েছিল কাবেরীর। দু-জনের মধ্যে কি-ই বা পার্থক্য? কিচ্ছু না। সেও গ্র্যাজুয়েট, বউটাও। অথচ....

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই কে যেন ডাকল— 'রিংকিদি'। সামান্য চমকে বাঁদিকে তাকাল কাবেরী। পাশের বাড়ির ডালিয়া। ওদের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। কাবেরীকে দেখে খুব একচোট হেসে বলল— 'হেভ্যি ঘুমিয়েছ তো! মুখ চোখ ফুলে আছে!'

একটু লজ্জা পেল কাবেরী। বলল— 'ভ্যাট, তেমন কিছু না।'

— 'বললে হবে?'— ডালিয়া তখনও হাসছে—

'আয়নায় গিয়ে দ্যাখো। ... হ্যাপি হাউসওয়াইফ।'

ডালিয়া মেয়েটা বাপ্পার চেখে খুব বড় নয়। বাপ্পার চব্বিশ চলছে। এর মেরেকেটে তিরিশ হবে। পনেরো বছর আগে কাবেরীরা যখন এপাড়ায় এল, তখন ফ্রক পরে, বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত। একটু পাকা। তখন থেকেই কাবেরীকে রিংকিদি বলে ডাকে।

— 'অফিস যাওনি আজ?'— কাবেরী জিজ্ঞেস করল।

— 'ধুর। বাঙ্ক করলাম। ... কাল লেটনাইট করেছি।'

কাবেরী ভালোই জানে, এই মেয়েটার চাকরির কোনও দরকার নেই। ওদের ফ্যামিলি-বিজনেস আছে। কলকাতায়। বাপ-মার একটাই মেয়ে। দোতলা বাড়ি, বিস্তর পয়সা। তবুও মেয়েটাকে বিয়ে করতে রাজি করাতে পারেনি বাপ-মা। নিত্য নতুন বয়ফ্রেণ্ড জুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পার্ক স্ট্রীটের একটা প্রাইভেট ফার্মে জুনিয়র এক্সিকিউটিভের চাকরি করে। মাইনের টাকা ব্যাঙ্কে জমায়, আর দেদার ফুর্তি করে। মাঝরাতে কারও গাড়ি এসে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়। কলকাতার খুব কাছে হলেও উত্তরপাড়া কলকাতা নয়, মফঃস্বল। আশপাশের বয়স্ক মানুষেরা ভ্রূকুটি করেন। কাবেরীর শাশুড়িও বলতেন— 'ওই এলেন মহারাণি।' মেয়েটা পাত্তাই দেয় না।

— 'বেশ আছ।'— কাবেরী একটু হাসল।

— 'অফ্ কোর্স। ফাস্ট লাইফটাই তো লাইফ! তোমার মতো গুডি-গুডি তো নই!

কাবেরী একটু চাপা নিশ্বাস ফেলল। ... গুডি গুডি! ঠিকই বলেছে ডালিয়া। সারা জীবনে একবারও ফোঁস করতে পারল না।

— 'স্টিল আই এনভি ইউ।'— আবারও হাসল ডালিয়া।

— 'আমাকে? হিংসে?'

— 'হোয়াই নট? ফিগারখানা এখনও যা রেখেছ না, ফ্যান্টা। হাসিটা.... সো সুইট। মাঝে জেঠিমাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছিলে, এখন শি ইজ গন, সঞ্জীবদা ইজ আ গুড গাই। দু-দুটো ব্রিলিয়ান্ট ছেলেমেয়ের মা! হোয়াট মোর?'

— 'তা ঠিক। ... হোয়াট মোর? ... আর কি চাই?'

তবুও কেন যে ভেতরটা ছলাৎ ছলাৎ করে! কান পাতলে কোথায় যেন একটা বিপদের ঘন্টি শোনা যায়। বাঃ। ... সোহিনিকে বারণ করে দিতে হবে। ... এসব আর হয় না।

— 'তুমি এবার বিয়ে-টিয়ে করো।'— কথা ঘোরাল কাবেরী।

— 'দুদ্দুর! ওসব তোমাদের জন্য। যা পাচ্ছি, সব ফ্রি অফ কস্ট। শুধুশুধু ঝামেলায় জড়াতে যাব কেন?'

— 'তাহলে জীবনে একটা স্থিতি তো দরকার।

— 'ওয়াও! কি ভালো-ভালো বাংলা বলছ গো! এসব শিখলে কোথায়? তুমি না বাইরের মেয়ে?

— 'তাছাড়া, শরীরটাও তো রাখতে হবে।

— 'উঁহুহু! শরীরের কথা তুলবে না। শরীর একদম ফিট। বারন্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ডানহাতটা বার করে দিল ডালিয়া। বলল— 'দ্যাখো, ছুঁয়ে দ্যাখো। একটা নখের আঁচড় পর্যন্ত পাবে না। ভ্যানিশ! সব ভ্যানিশ!'

হাত নয়, ওর মুখটা দেখছিল কাবেরী। আর মনে মনে একটা হিসেব করছিল। মেয়েটা ওর থেকে টেনে-টুনে সতের-আঠারো বছরের ছোট হবে। পুরোপুরি পরবর্তী প্রজন্ম নয়। অথচ একদম অন্যরকম। কত তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে দুনিয়া! আচ্ছা... সুন্দরগড়েও কি এরকমই হচ্ছে? নাকি, এ কলকাতার হাওয়া? বালি ব্রিজ পার হয়ে দ্রুত এখানে এসে ঢুকেছে!

... ভ্যানিশ! সব ভ্যানিশ!.....

কি অবলীলাক্রমে বলছে মেয়েটা!

অথচ, বিয়ের এই পঁচিশ বছর পরেও শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় সঞ্জীবকে হাত ছোঁয়াতে দেয় না কাবেরী। হাত দিলেই বলে— 'আঃ! ছাড়ো না! লাগে!'

— 'হাই রিংকিদি! একেবারে অফ হয়ে গেলে যে! কি ড্রিম করছ গো?'

— 'নাঃ! কিছু না। যাই, সন্ধে দিতে হবে।'

— 'ওহ্, দ্যাট রিলিজিয়াস রিচুয়্যাল! ... তোমাকে মাঝে মাঝে ছাদে দেখি বটে। লালপাড় শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, হাতে প্রদীপ, তুলসীমঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে বাও করছ। খুব কিউট লাগে তখন তোমাকে। মনে হয়, একটা কিস্ করি।'

— 'চুপ!'— চাপা ধমক দিল কাবেরী।

— 'ওকে, বাবা, ওকে। বেগ ইওর পার্ডন।'—

হাসতে হাসতে সদ্য নেমে আসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডালিয়া।

একতলায় নেমে এল কাবেরী। গা ধুলো। চেঞ্জ করল। লাল পাড়, সাদা শাড়ি। সামান্য ঘোমটা টানল। একতলায় বসার ঘর পার হয়ে শাশুড়ির ঘর। এখন ফাঁকাই পড়ে থাকে। তারই এককোণে ঠাকুরের সিংহাসন।

আসন পেতে সামনে বসল কাবেরী। সে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানে না। শুধু ধূপ-দীপ জ্বালায়, আর চোখ বুজে বসে থাকে। ছেলেমেয়ে, স্বামীর মঙ্গল চায়। নিজের জন্য কিছু চায় না, লজ্জা হয়। সামান্য ভোগ দেয় ঠাকুরকে— বাতাসা, মিছিরি, নকুলদানা। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। সারা বাড়ি ঘুরে ধূপ-দীপ দেখায়। শাঁখ ভালো বাজাতে পারে না এখনও। তবুও একটু চেষ্টা করে। শাশুড়ি ভালোই বাজাতে পারতেন। ছাদে গিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখিয়ে, মাথা ঠেকিয়ে শেষ হয় তার কাজ।

আজও তাই হল। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে মনে পড়ল, ডালিয়ার কথাটা। কানদুটো লাল হয়ে উঠল।

নিজের ঘরে এসে লালপাড় শাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল কাবেরী। তেমন কোনও কাজ নেই। টুক্‌টাক্ সামান্য কেনাকাটা। তারপর ব্রিজ ধরে একটু হেঁটে আসবে। সারাদিন বাড়িতে একা, প্রায় বন্দি। সঞ্জীব বেরিয়ে গেছে সেই কখন। ফেরার কোনও ঠিক নেই। অফিসার হয়ে যাওয়ার পর থেকে এরকমই হচ্ছে।

হাল্কা সাজল কাবেরী। ঠোঁটে লিপস্টিক দিল কি দিল না। কপালে একটা ছোট টিপ লাগাল। ঘাড় পর্যন্ত চুল খুলেই রাখল। জুতোর র‍্যাকের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। চটি পরবে না জুতো? কাল থেকে আজ একটু আগে পর্যন্তও বৃষ্টি হয়েছে খেপে খেপে। তার মানে, রাস্তায় কাদা। চটি পরে ফট্‌ফট্ করার কোনও মানে হয় না। নির্ঘাত কাদা ছিটবে, পা-ঢাকা পাম্প-সু-ই ভালো।

সিঁড়ি দিয়ে খুটখুট পায়ে নেমে আসছে কাবেরী। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ধরা মুঠোফোন। হঠাৎই মনে পড়ল, সোহিনির মেসেজের জবাব দেওয়া হয়নি।

নিচে নেমে ব্যাগ থেকে চশমাটা বার করে মেসেজটা আরেকবার পড়ল কাবেরী।

... কি রে রিংকা, কি করছিস?

নিজের মনেই একটু হাসল কাবেরী। তারপর বোতাম টিপে টিপে উত্তরটা লিখল— 'ঘোড়াড্ডিম!'...

কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল।

একটা চৌকো কাগজ বাতাসে উড়ছে। তার মাথায় একটা লাল সূর্যের ছবি। ছবিটা দেখেই কাগজটা কি বেশ বোঝা যায়। সুতরাং, কাগজটা ধরার জন্য দৌড়তে শুরু করেছে সে। মুঠোর মধ্যে প্রায় এনেও ফেলেছে, এমনসময় কাঁটাতারের বেড়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর ঘুড়ির মতো চৌকো কাগজটা বাতাসে দুলতে দুলতে সাঁ-সাঁ করে উঠে গেল ওপরে।...

কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল— 'ভোকাট্টা।'...

তারপর থেকে আর ঘুমটা ভালো হয়নি। ওদের প্রিন্সিপাল প্রহরাজ বলতেন— 'লুক অ্যাট দিস লোগো। সানসাইন। ইটস্ আ গ্লোরিয়াস বার্থ অফ অ ডে।'

ভোরের সূর্য খুব একটা দেখা হয় না ওর। মোটের ওপর একটু লেট-লাইজার। তবুও কখনও ভোরের ট্রেন বা প্লেন ধরতে গিয়ে দেখেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে প্রিন্সিপাল প্রহরাজের কথা।— 'গ্লোরিয়াস বার্থ অফ আ ডে।' আর দেখেছে মাঝেমাঝে স্বপ্নে। লাস্ট কবে দেখেছে অবশ্য মনে পড়ে না।

চুপচাপ শুয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। সারাদিনের কাজের তালিকাটাও মাথার ভেতর ঘুরঘুর করতে লাগল। দশটায় হোটেল সী-হক, তারপর হোটেল রূপসী, তারপর সী-ভিউ প্লাজা। এরকম অনেক হোটেলেই ওরিয়েন্ট মেশিন বেশ ভালোই চলছে। এমনকি সে নিজে হোটেল ডলফিনের যে রুমে আছে সেখানেও মে মাসের দুঃসহ গরমকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে ওরিয়েন্ট মেশিন। যত ভোর হয়ে আসছে, একটু ঠাণ্ডাই লাগছে। পায়ের কাছে থাকা চাদরটা টেনে নিয়ে রিমোটের সুইচটা টিপে দিল। বন্ধ হয়ে গেল ওরিয়েন্ট। এয়ারকন্ডিশনার। ধপ্‌ধপে সাদা রঙের ওপরে লাল সূর্য। এটাই

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
INDIA TRADE MARK
R
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ওরিয়েন্ট এয়ারকণ্ডিশনারের লোগো। ব্র্যাণ্ড সাই। ... সানশাইন।.... বার্থ অফ আ গ্লোরিয়াস ডে।'....

হয়তো তাই। শুরুটা হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। আর শুরুর শুরুটা আরও দশ বছর আগের। তখন বয়স সাতাশ। ছোটখাট ইলেকট্রিক্যাল জিনিস সারাই আর রুটিন সার্ভিসিং। বিক্রম তখন থেকেই ওর পার্টনার। বয়েসে অবশ্য ওর থেকে একটু ছোট। তবে ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিতে উৎসাহ নেই, বিজনেস করবে। একটু একটু করে এগোতে হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে দেশের জমিজমা বেচে দিয়েছে দু'জনেই। তারপর মাত্র পঞ্চাশ জন কর্মচারী নিয়ে শুরু হল ওরিয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ। এয়ারকণ্ডিশনার। বাজারে রাঘব বোয়ালের অন্ত নেই। ন্যাশনাল, মাল্টিন্যাশনাল। তবুও দাঁড়িয়ে গেল ব্যবসাটা। দাম একটু কম, অথচ জিনিস খারাপ নয়। এক বছরের জায়গায় দু-বছর ফ্রী সার্ভিসিং। বাড়িতে না হলেও হোটেল, অফিস, হসপিটাল— এসব জায়গায় চাহিদা মন্দ নয়। দশ বছরে পঞ্চাশ জনের জায়গায় কর্মচারীর সংখ্যা এখন প্রায় পাঁচশো। তাদের মাইনে, বোনাস, ইনকাম ট্যাক্স, এটা-সেটা দিয়েও লাভ মোটামুটি ভালোই থাকে দুই পার্টনারের। ওড়িশার সীমানা ছাড়িয়ে কলকাতার মার্কেট ধরার জন্যও চাপ দিচ্ছে বিক্রম।

কলকাতা!

বিছানা থেকে নেমে জানালাটা খুলেই দিল সে। সোজাসুজি তাকালেই সমুদ্র। এখনও অন্ধকার পাতলা হয়ে গেলেও দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। তবে গর্জন শোনা যাচ্ছে। রেডিয়াম দেওয়া হাতগড়ির দিকে তাকাল সে। চারটে দশ। আলো ফুটতে আর খুব বেশি দেরি নেই। একটু পরেই বেশ কিছু লোক এসে জুটে যাবে সী-বিচে। সানরাইজ দেখবে। কয়েকজন অতি উৎসাহে দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে— 'জয় জগন্নাথ।' কারণ, জায়গাটা পুরী।

বাসি মুখেই একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর একটু একটু করে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার আরও পাতলা হতে শুরু করেছে। শুরু হয়ে গিয়েছে রাস্তায় লোক চলাচল। কি মনে হতে সিগারেটটা দ্রুত অ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিয়ে ট্রাউজার্সের ওপর পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে রুমের বাইরে চলে এল সে। লক্ করে চাবিটা পকেটে পুরে নেমে গেল রাস্তায়।

আজকের দিনটা হোক না একটু অন্যরকম। এদের সবার সঙ্গে বিচে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখবে সে।

রাস্তায় পা দিতেই কে একজন যেন তার দিকে হাত নেড়ে বলল— 'হ্যালো, মিস্টার পাণ্ডে।'

লোকটাকে এক লহমায় ঠিক চেনা গেল না অবশ্য। সঙ্গে মনে হয় ওর স্ত্রী আর মেয়ে। ওর দিকে আঙুল তুলে স্ত্রী আর মেয়েকে বলল— 'মিস্টার জয়দীপ পাণ্ডে। ওরিয়েন্ট এয়ারকণ্ডিশনার।'

শুনে অবশ্য একটু হাসিই পেল। জয়দীপ আর ওরিয়েন্ট— ওর যেন দুটো নাম। আর দুটোই একসঙ্গে উচ্চার্য। ভালো! নট ব্যাড।

বালি ভেঙে চলতে শুরু করল। আশপাশে যারা সবাই টুরিস্ট। বাঙালিই বেশি। বাঙলা বুঝতে তার অসুবিধা নেই। বলতেও পারে, হিন্দি, ইংরাজি— কোনওটাতেই অসুবিধা নেই। একটা সময়, দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুদের দৌলতে তামিল, তেলুগুও কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছিল। এখন অবশ্য আর মনে নেই।

একটা জায়গায় গিয়ে সবাই জড়ো হয়েছে। সেও দাঁড়াল। বাঙালি আলাপ করতে ভালবাসে। এরই মধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন তাকে জিজ্ঞেস করল— 'আপনি টুরিস্ট?'

সে একটু হেসে বলল— 'না, বিজনেস।'

— 'প্রায়ই আসেন?'

— 'প্রায়ই।'

— 'বাঙালি?'

— 'না, ওড়িয়া।'

— 'ওড়িয়া! কিন্তু ভালোই তো বাংলা বলেন।'

— 'ওই আর কি!'

— 'ওয়াইফ নিশ্চয়ই বাঙালি?'

— 'ওয়াইফ! না।'

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে। শেষরাতের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। চৌকো একটা কাগজ, তার হাত ছাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। লোগো, রক্তিম সূর্য।

.... চুপচাপ প্রিন্সিপাল প্রহরাজের ঘরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। একনাগাড়ে তাকে ধমকে যাচ্ছিলেন প্রিন্সিপাল।

— 'ছেড়ে দিচ্ছ, মানে? লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছ!'

সে নিরুত্তর।

— ফাইনাল ইয়ারে উঠে... এত ভালো রেজাল্ট তোমার। সে তবু চুপ।

— 'এর মানে কি জানো?'

এবারে সে খুব নিচু গলায় উত্তর দিয়েছিল— 'জানি স্যার।'

— 'তবে? লুক অ্যাট দিস পেপার।'— টেবিলের ওপর থেকে চৌকো কাগজটা তুলে ধরেছিলেন প্রহরাজ। সেই একবারই সে কাগজটা দেখেছিল। ধপ্‌ধপে সাদা কাগজের ওপর জ্বলজ্বল করছে ভোরের সূর্য।

— 'দিস ইজ নট ওনলি আ পেপার। দিস ইজ আ সার্টিফিকেট। আ গ্রেট রেকগনিশান। আর ইউ লেটিং ইট

অফ?'

— 'ইয়েস স্যার।'

— 'দেন নেট আউট ফ্রম মাই রুম।...

প্রহরাজ আজ আর বেঁচে নেই। থাকলে হয়তো খুশি হতেন। কারণ, গত বছর কটকের সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকেই সমাবর্তনের দিনে ওকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন ছাত্র এবং সফল শিল্পপতি হিসেবে। যাব না, যাব না করেও গিয়েছিল শেষপর্যন্ত। তুমুল করতালির মধ্যেও হাত পেতে মানপত্র নিতে খুবই লজ্জা করছিল ওর। সংক্ষিপ্ত জবাবী ভাষণে নিজের সম্বন্ধে সত্যিটাই উচ্চারণ করেছিল।— 'আয়্যাম নট ম্যান ইঞ্জিনিয়ার লাইক ইউ। আই কুড নট বি। আই গেভ আপ মাই স্টাডিজ। বাট ইউ আর নন গ্র্যাজুয়েটস্, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটস। মাই বেস্ট উইশেস ফর ইউ।'

ফিরে এসে ফেসবুক খুলে অবাক হয়েছিল সে। আজকাল খবর চলে জেট প্লেনেরও বেশি গতিবেগে। ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়েছে তার ব্যাচের অনেকেই। — 'হাই জে, উই আর প্রাউড অফ ইউ।'

হঠাৎ-ই একটা সমবেত চিৎকারে চমক ভাঙল ওর। সমুদ্রের ভেতর থেকে হঠাৎই যেন ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে সূর্য! মৃদু লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলে, বালিয়াড়িতে, টুরিস্টরা ছবি তুলছে পটাপট্। কি ভেবে নিজের মোবাইল বার করে সেও ফটো তুলল একটা। ... সানসাইন! গ্লোরিয়াস বার্থ অফ আ ডে!...

আশপাশে কলকাকলি বেড়ে চলেছে। সবাই খুশি। পরিশ্রম সার্থক। কে একজন বলল— 'কালও এসে ঘুরে গিয়েছি। সুবিধা হয়নি। আকাশে মেঘ ছিল।' আরেকজন জলদগম্ভীর স্বরে সূর্যস্তব শুরু করে দিল— 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম...'

মন্দ নয়, মন্দ নয়। ভালোই শুরু হল যে দিনটা। তবুও রোজই এত ভোরে ওঠা পোষাবেনা ওর।

ভিড়টা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে, তখনই বালিয়াড়ি ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। সূর্য এখন তার মাথার পিছনে, উল্টোদিকে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই তার মনে হল, সূর্য কি সারারাত ঘুমোয়, না, জেগে থেকে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে? সারা পৃথিবী ঘুরে সে অন্ধকারের সঙ্গেই বোধহয় নিরন্তর যুদ্ধ করে। শুধু তার সংগ্রামটা চোখে দেখা যায় না। যা চোখে দেখা যায়, সেটা তার সাফল্য।

ভাবতে ভাবতে তার নিজেরই একটু হাসি পেল।

কটকের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। কোথায় তার শেষ, জানত না সে।

এইসময় একদিন সোহিনি এল। সুন্দরগড় স্টিল সিটিতে ওদের উল্টোদিকের কোয়াটার্স।

বলল— 'তোর কি মাথা-টাথা খারাপ?'

সে নিরুত্তর। যেমন নিরুত্তর ছিল প্রিন্সিপাল প্রহরাজের সামনে।

উত্তর না পেয়ে সোহিনি জিজ্ঞেস করেছিল— 'এখন কি করবি?'

— 'দেখি।'

— 'কি দেখবি? তোর মতো নাম-কাটা ইঞ্জিনিয়ারকে কে চাকরি দেবে? ঘরের পয়সার শ্রাদ্ধ করলি। ছিঃ ছিঃ!'

আর কোনও উত্তর না দিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

সোহিনি ওর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে টেনে বলল— 'এই, ওঠ্।'

— 'জ্বালাসনা আমাকে।'

সোহিনি ডান হাতে একটা চড় তুলতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল। ওর দু-চোখের তলায় তখন কালি। দৃষ্টি শূন্য। অন্ধকারে সুড়ঙ্গে পথভ্রষ্ট।

— 'তুই ডাক্তার দেখা।' — সোহিনি বলেছিল। — 'বাড়াবাড়ি করছিস।'

— 'দরকার নেই। শরীর ঠিক আছে।

— 'তাহলে যা, বন্ধুদের সঙ্গে অন্তত আড্ডা মার।'

— 'দেখি!'

প্রায় দু-মাস অন্তরীণ থাকার পর অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়েছিল সে। তাও বেশিক্ষণ ভালো লাগত না। বন্ধু-বান্ধবদের ঠাট্টাতেও বিরক্ত লাগত।

এভাবেই কেটে গিয়েছিল প্রায় মাস ছয়েক। তারপরেই এল একটা প্রবল ধাক্কা। আর সেই ধাক্কাটাই বাস্তবের রুক্ষ জমির ওপর দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। এখন ভেবে দেখলে তার মনে হয়, জীবনের ওই সময়টায় ওই ধাক্কাটারই হয়তো বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার। একটা ধাক্কা আরেকটা ধাক্কাকে কাটিয়ে দিয়েছিল। বিষে যেমন বিষক্ষয় হয়।

সোহিনি বলেছিল— 'তুই স্টীল প্ল্যান্টে ঢুকে যা। কাকুর সাডেন ডেথ। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। কারণটা অবশ্য তুই। তবুও কমপ্যানসেট গ্রাউন্ডে চাকরি পাবি।'

তা অবশ্য পেত। মজদুরের চাকরি। নাম-কাটা ইঞ্জিনিয়ারকে এর চেয়ে বেশি আর কেই বা কি দেবে? কোম্পানি সদাশয়। দুই রুমের কোয়াটার্সটাও ছাড়তে বলেনি।

তবুও ছেড়ে দিয়েছিল সে। চাকরি নেয়নি। জানত, দাদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ফিরেও তাকাবে না। বোনও বিবাহিতা, থাকে দিল্লিতে। তারও বয়ে গেছে। মাকে নিয়ে সে চলে গেল সুন্দরগড় স্টীল সিটির প্রান্ত ছাড়িয়ে বকুলপুরে। রোজগার? সেই চেষ্টাও শুরু করল বইকি! সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম সারানো। জীবনযুদ্ধের সেই শুরু।

বালিয়াড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে থেমে পেছনে ঘুরে তাকাল সে। সূর্য এরই মধ্যে অনেকটা ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। আশপাশে টুরিস্টদের কলকাকলি আরও বেড়ে উঠেছে। বিচের ওপর চায়ের দোকানগুলো জেগে উঠেছে। আজকাল ওরা সারি-সারি প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে রাখে। হাতে চায়ের পাত্র নিয়ে সেখানে বসে আছে অনেক টুরিস্ট।

এক কাপ চা সে-ও কিনল। তবে চেয়ারে বসল না। সমুদ্রের একেবারে ধারে চেয়ার পেতে বসতে ওর কেমন হাসি পায়। চটি খুলে বালির ভেতর পা ডুবিয়ে মাটিতেই বসল সে। বালি সারারাতের পর এখনও ঠাণ্ডা, নরম। সামান্য ভিজে ভিজে। যেখানে সে বসেছে, ঢেউ তার খুব কাছ দিয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে তাকেও ভিজিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চা সে একটু গরমই খায়। তিন চুমুকে শেষ করে দিল।

— 'এক্সকিউজ মি, লাইটার হবে আপনার কাছে?'

সামান্য চমকে ঘুরে তাকাল সে। আবারও একজন টুরিস্ট। বাঙালি।

কোনও কথা না বলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে লাইটার বার করে দিল সে। বালির ওপর এবারে পা ছড়িয়ে বসল। সে লম্বায় পাঁচ-দশ। মাঝারি স্বাস্থ্য। রং ফর্সা নয়, আবার ঠিক কালোও বলা যাবে না। মাথার চুল আলুথালু। বাতাসে উড়ছিল। মুখ লম্বাটে। কিছুদিন হল একটু চাপদাড়ি রাখছে। । ট্রিম করতে হয়।

— 'আপনি বাঙালি?'

সেই এক প্রশ্ন। লাইটার ফেরত দিল লোকটা। সিগারেট ধরিয়ে টান মেরে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। সমুদ্রের বাতাসে হারিয়ে গেল সেই ধোঁয়া।

— 'আপনার হাইটটা অবশ্য সাধারণ বাঙালির তুলনায়... কত হবে.... ছয়-টয়?'

এবারে সে একটু হাসল। মাথা নাড়ল। না।

— 'টুরিস্ট তো, নাকি?'

— 'বিজনেস।'

— 'বিজনেস!'— লোকটা যেন চমকে উঠল। ভাবটা, পুরীতেও আবার কেউ বিজনেস করতে আসে নাকি!

— 'ও, সেইজন্যই আপনি একা। এখানে তো আমরা সবাই ফ্যামিলি নিয়ে.... ওই তো দেখুন না স্টলের চেয়ারে বসে আমার মিসেস আর দুই মেয়ে চা খাচ্ছে....'

একটু মাথা নাড়ল সে। তবে 'একা' শব্দটা ফট্ করে তার কানে লেগে গিয়েছে।

বছর দুই হল মা বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছিল। পঁয়তাল্লিশ পার হতে চলল। আর কবে বিয়ে করবে? চাপ দিচ্ছিল দাদা-বউদিও। হয়তো ভাবছিল, মা আজ আছে তো কাল নেই, শেষটায় কি ওর দায় ওদেরই টানতে হবে।?

এখন আর সে একা নয়। দু-বছর হয়ে গেল, আর একা নয়। তবুও সে ভাবে, আর একটা বছর পর হলেই সে আর বিয়ে করত না।

শুনে সোহিনি বলেছিল— 'লাভ কি হত? কেউ কি এসে তোর হেঁসেল ঠেলত?'

হেঁসেল শব্দটার মানে অবশ্য বুঝতে পারেনি সে। তবে আন্দাজে বুঝেছিল, এর মানে কোনও একটা দায়িত্ব, সর্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি।

নিজের মনেই একটু হেসেছিল কথাটা ভেবে। চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল অনেক বছর আগের একটা খণ্ডচিত্র।

মাস ছয়েক হয়ে গেল তখন সে ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম সারানোর ব্যবসা করছে। শ্রীবাস্তব আন্টির ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের প্লাগটা সারাতে সে গিয়েছিল সুন্দরগড় স্টীল সিটির ভেতরে তার পুরনো পাড়ায়। হঠাৎ-ই চোখে পড়েছিল রাস্তার উপরে কোয়ার্টার্সের বাগান থেকে দ্রুত ভেতরে সরে গেল একটি নারী শরীর। আঁচল দিয়ে সারা শরীরটাকেই যেন সে আবৃত করে ফেলতে চাইছে।

ফেরার পথে সাইকেল থামিয়ে সোহিনিকে সে জিজ্ঞেস করেছিল— 'কি ব্যাপার?'

সোহিনি বলেছিল— 'ওদিকে আর তাকাস না। ওর পেটে বাচ্চা আছে।'

বাচ্চা!

তুলিকা, ওর বউ বাচ্চা চায় না। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, চায়না, নাকি সে নিজেই জানে, ওরও বয়স চল্লিশ পার, আর হবে না।

রাত্রে বিছানায় দু-দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় দু'জনে। নাঃ, তবুও তাকে একা বলা যায় না।

এই সাতচল্লিশ বছরের জীবনে তার বাচ্চা একটাই। পার্টনার বিক্রমের মেয়ে। যার নাম ও নিজেই দিয়েছে পিঙ্কি।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে, এবারে উঠতে হয়। কাজের সময় এগিয়ে আসছে। বিজনেস! পুরীতে বিজনেস! টুরিস্টরা শুনে কেন যে অবাক হয়!

লম্বা লম্বা পা ফেলে বালিয়াড়ি ধরে এগোতে লাগল সে। সাড়ে ৯টা থেকে বিজনেসের শুরু। আর তাকে যারা চেনে, সবাই জানে, মিস্টার জে-র কাছে সাড়ে ৯টা মানে সাড়ে ৯টাই। কম বেশি হবার নয়।

সাধে কি আর তাকে ঘটা করে শিল্পপতি হিসেবে সম্মান জানিয়েছিল তার ফেলে আসা কলেজ! অভিনন্দনের বন্যায় সে ভেসে গিয়েছিল সেদিন। ভুলে গিয়েছিল যে সে নামকাটা ইঞ্জিনিয়ার।

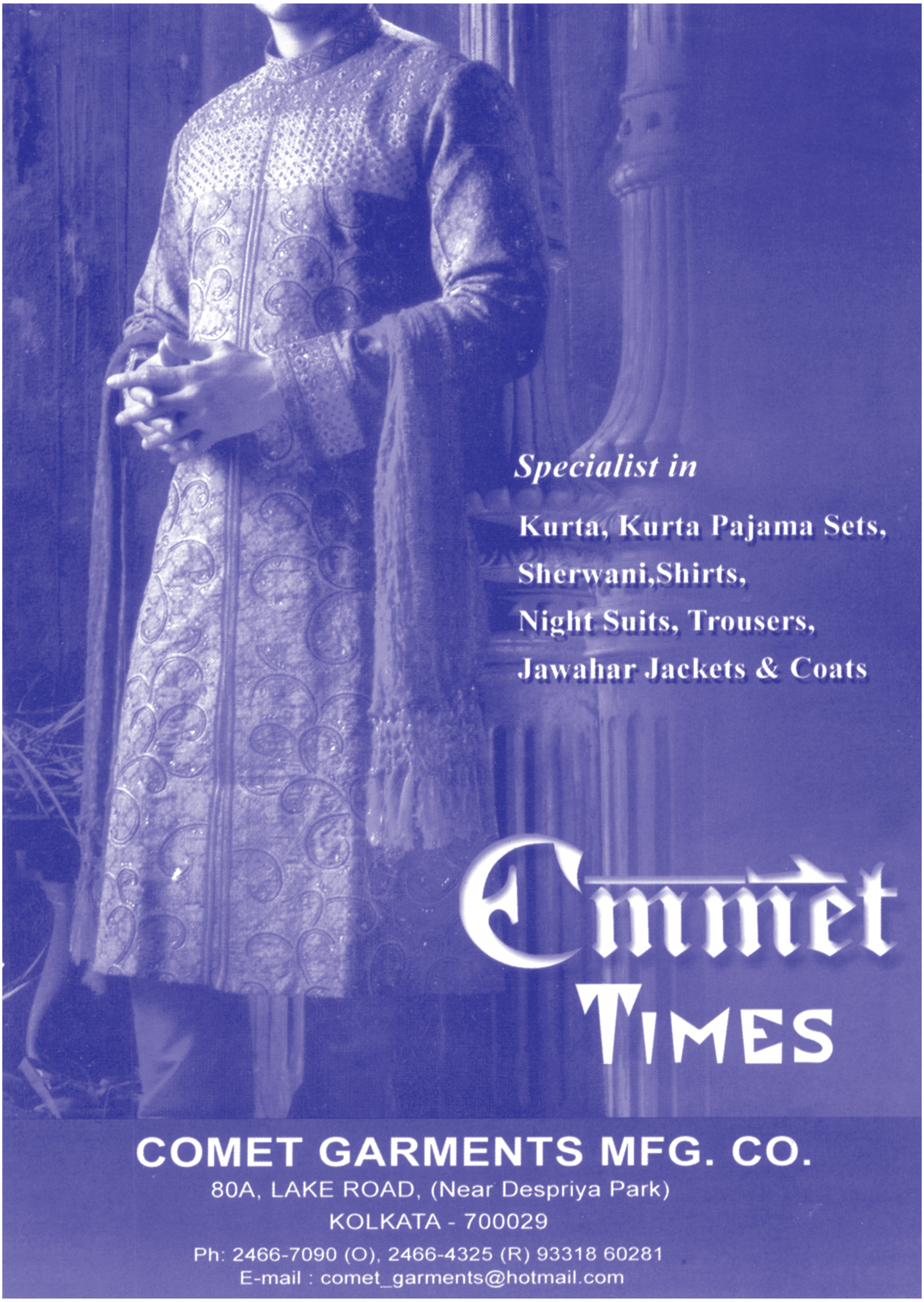
Specialist in
Kurta, Kurta Pajama Sets,
Sherwani,Shirts,
Night Suits, Trousers,
Jawahar Jackets & Coats
Comet
TIMES
COMET GARMENTS MFG. CO.
80A, LAKE ROAD, (Near Despriya Park)
KOLKATA - 700029
Ph: 2466-7090 (O), 2466-4325 (R) 93318 60281
E-mail : comet_garments@hotmail.com

শুধু সেইদিন বাতাসে ভেসে আসা একটি মেসেজের মর্মোদ্ধার আজও করতে পারেনি সে। আজও তার মনে আছে সেটা। ছোট্ট একাট মেসেজ। আনন্দের দিনে একেবারেই বেমানান। — 'আয়্যাম স্যরি।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে ইউ এস এ-তে দাদাকে একটা মেল করছিল সৌমি।

মন-মেজাজ খুব ভালো নেই। থার্ড ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল, কলেজ ছুটি, কোথায় বাড়ি পালাবে, তা নয়, ঠিক এখনই এসে জুটল কুড়ি দিনের একটা ট্রেনিং কোর্স। কুড়ি দিন! ওফ্!

আর মাকেও বলিহারি! শুনে কোথায় একটু আপসোস করবে, তা নয়, বেশ খুশি খুশি গলাতেই বলল— 'ওমা, তাই নাকি! স্যাক্সবি এ্যান্ড স্যামসন! ওটা তো খুব বড় একটা মেডিকেল কোম্পানি! তোর বাপির মুখে নামটা শুনেছি। ওদের অফিসের সঙ্গে ওই ফার্মটির কি সব যেন ট্রানজাকশান হয়। ঢুকে পড়, ঢুকে পড়।'

মার আর কি! সারাদিন শুয়ে-বসে আর টিভি দেখে দিন কাটে। এখন তার সঙ্গে জুটেছে ফেসবুক। আর আছে মোবাইল ফোন। চান্স পেলেই চোখে চশমা এঁটে পুটুস পুটুস করে মেসেজ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টুংটাং, টুংটাং। তার মানে, পাল্টা মেসেজ আসছে। একদিন এরকম একটা মেসেজ হঠাৎই চোখে পড়ায় চমকে উঠেছিল সৌমি। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল— 'এর মানে?'

মা থমথমে মুখ করে বলেছিল— 'আমার পার্সোনাল মেসেজ। তুমি পড়লে কেন?'

পার্সোনাল! শিট্!

ভাবতেই মুখটা বিকৃত করে সৌমি। মার পুরো লাইফটাই তো পার্সোনাল। উল্টোভাবে বলতে গেলে, নাথিং অফিসিয়াল অ্যাবাউট ইট। আগাপাস্তলা নিষ্কর্মার জীবন। পাস গ্র্যাজুয়েট, বাইশ বছরে বিয়ে। এই নিয়ে কম হাসাহাসি করেছে সৌমি! —'কি গো তুমি! দাদু-দিদা বলল, আর বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়লে! কোনও অ্যাম্বিশান নেই তোমার!'

সৌমির নিজেরই এখন একুশ চলছে। ব্যাঙ্গালোরে ডেকান ইউনিভার্সিটিতে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থার্ড ইয়ার শেষ হল। এরপর ফাইনাল ইয়ার। তার মানে বাইশে বি টেক। তারপর মাস্টার্স, পি এইচ ডি। দাদার মতো বিদেশে। একখানা ঝিংচাক কেরিয়ার বানাতে হবে। তা নয়, বাইশ বছরে বিয়ে! দুদ্দুর!

মা অবশ্য বাগড়া দিচ্ছে। বলছে— 'এসব অন্তত পাঁচ-সাত বছরের ধাক্কা। বয়সটা তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবেছিস?'

সৌমি বলেছে— 'কেন? এখন কেউ থার্টি-থার্টি টুর আগে বিয়েই করে না। তোমাদের ওসব গন কেস।'

মা তখন বিজ্ঞের মতো বলেছে— 'অত বয়েসে বাচ্চা হতে সমস্যা হয়।'

সৌমি উড়িয়ে দিয়ে বলেছে— 'শুধু বিয়ে, ঘরকন্না আর বাচ্চাকাচ্চা, এর বাইরে কিছু ভাবতেই পারলে না মা!'

মা চুপ করে গিয়েছে। আর মাকে খোঁচা মেরে সৌমিও বেশ তৃপ্তি পেয়েছে। আসলে, মা খুব সাদামাটা অর্ডিনারি। তুলনায় সে আর দাদা পড়াশুনায় তুখোড়। দাদা এখন ইউ এস এ-র টেক্সাসে ইলেকট্রনিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রি করছে। এবছর ফাইনাল। খুব ভালো ক্রিকেট খেলত দাদা। সৌমিও ভালো ক্যারাটে জানে, জানে সুইমিং ও ওড়িশি নাচ। মায়েরেই সন্তান ওরা। অথচ তুলনায় মা-নাথিং।

তবুও মাকে খোঁচা মেরে সৌমি তৃপ্তি পায়। কারণ, মা এখনও খুব বিউটিফুল। সৌমি দেখতে মোটামুটি। আসলে তাকে দেখতে খানিকটা বাপির মতো। বাপির মুখটা একটু লম্বা, সেটা ছেলেদের হয়তো মানিয়ে যায়, মেয়েদের একটু ঘোড়া ঘোড়া লাগে। মনে আছে, খুব ছোটবেলায় ঠাম্মি তাকে বলত— 'এটা তো একটা মাদী ঘোড়া।' এখনও মার সঙ্গে বেরোলে যে কেউ বলে— 'তোমার মেয়ে? বোঝা তো যায় না।'

এইসব সময়ে মার মুখটা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে সৌমি। মার হাসিতে তখন কি আরও একটু বেশি মুক্তো ঝরে? মার দাঁত খুব পরিপাটি। সৌমিরই বরং ওপরের পাটিটা সামান্য উঁচু। সেইজন্যই মাকে খোঁচা মেরে মাঝে মাঝে শোধ তুলে নেয় সৌমি। হতে পারে ওরা মা-মেয়ে। তবুও তো দুই নারী!

আজ রবিবার, ছুটি।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই দাদাকে মেল্‌টা সেরে ফেলল সৌমি। ইউ এস এ-র কয়েকটা ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে একটু পাত্তা লাগানো দরকার। ওরা নাকি ভালো স্কলারশিপ দেয়। পরীক্ষার শেষ আর ট্রেনিং শুরুর ফাঁকে জি আর ই পরীক্ষাটা সেরে ফেলেছে সৌমি। দাদা গুঁইগাঁই করছিল। ফোনে বলছিল— 'আরও টাইম নে।' মারও আপত্তি ছিল। বলছিল— 'ভালো স্কোর না করতে পারলে কি কেউ স্কলারশিপ দেবে?'

দূর!

এত ভাবলে চলে না। ওদের উত্তরপাড়ায় পাশের বাড়ির ডালিয়ামাসি বলে না— 'যে যত ভাবে, সে তত ভ্যাবলা।' সহি বাত!

জি আর ই পরীক্ষার স্কোর শুনে দাদার নিজের চোখও বোধহয় ট্যারা হয়ে গিয়েছে। বাপি বলেছে— 'মিরাক্‌ল্‌!' মা কিন্তু সেই এক রেকর্ডই বাজিয়েছে— 'স্কলারশিপটা পাবি তো? না হলে টাকাপয়সার যা অবস্থা...'

সৌমি কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। একবার টাকার কথা তুললে মা আর থামতে চায় না। একেবারে ফিনান্স মিনিস্টারের বাজেট শুনিয়ে ছাড়বে। দাদাকে পাঠাতে কত খরচা হয়েছে থেকে শুরু করে মুদি দোকানের তেলের দাম পর্যন্ত। ডিসগাস্টিং।

সৌমির মনে হয় বলে— 'তাহলে তুমিও চাকরি করলেই পারতে! আমার কত বন্ধুর মায়েরা তো চাকরি করে। নিজেও তো বলো, তোমার অমুক বন্ধু এই, তমুক বন্ধু সেই। খালি বিগ বিগ টক্‌। তা নিজে এমন টুঁ-টুঁ কোম্পানি হয়ে বসে রইলে কেন? শুধু ঘর-সংসার, আর হয় টাইমে রূপচর্চা। যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে সরকারি অফিসে কেরাণির চাকরিও কিন্তু জুটত না!'

... আমিও দাদার মতো ফরেনে যাব। আমার জন্য টাকা ঢালতে হবে, ব্যস!। নো ডিসক্রিমিনেশান।'

আড়চোখে একবার রুমমেট কাম বন্ধু সুষমার দিকে তাকাল সৌমি। গুজরাটি মেয়ে। এখন একসঙ্গেই ট্রেনিং নিচ্ছে ওরা। চুপচাপ ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সৌমি।

এই মেয়েটারও তেমন কোনও এ্যাম্বিশান নেই। লেখাপড়ায় খারাপ নয়, বাবার পয়সাকড়িও ভালোই আছে। অথচ মামুলি একটা চাকরি পেলেই সন্তুষ্ট। আলসেও বটে। চান্স পেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। আজ রবিবার, ছুটি, কিরকম ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে দ্যাখো!

মেলটা ঠিকঠাকই দাদার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এখন একটু ফেসবুকে চ্যাট করাই যায় দু-চার পিস পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। তবে থাক, চিৎ হয়ে শুয়েই পড়ল সৌমি। একটা হাই তুলল। মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

পর্দায় একটা মেসেজ ফুটে উঠল। এটা আবার কখন এল? মন দিয়ে মেসেজটা পড়ল সৌমি। তারপর একটু হেসে ডিলিট করে দিল। সে নিজেও বুঝেছে, এসব আর হবার নয়।

কিন্তু মাকে বুঝতে দেয়নি। ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রতীককে যে মা খুব একটা পছন্দ করে না, সেটা সৌমি জানে। ওরা একসঙ্গে স্কুলে ইলেভেন-টুয়েলভে পড়ত। একসঙ্গে কোচিং-এও যেত। প্রতীকের ফ্যামিলি খুবই সাধারণ। ওর বাবা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। মার ছোটখাট একটা হোম সার্ভিসের ব্যবসা আছে। প্রতীক নিজেও পড়াশুনায় অর্ডিনারি। সৌমির ধারেকাছেও আসে না। তবুও হয়তো কম বয়সের জেরেই একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল ওদের মধ্যে।

টের পেয়ে মার মুখচোখের ভাব পাল্টে গিয়েছিল। তখনও সৌমির নিজের মোবাইল ফোন ছিল না। টিউশনের ব্যাগ থেকে প্রতীকের দুটো তিনটে চিঠি পড়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল মা। একদিন প্রতীককে বাড়িতে ডেকে এনে যাচ্ছেতাই করে অপমান করল। বলল— 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি কি সৌমির যোগ্য? ফের যদি এসব চিঠি-ফিঠি লিখেছ তো এক চড়ে তোমাকে ঠাণ্ডা করে দেব।'

মার এরকম অগ্নিমূর্তি কখনও দেখেনি সৌমি। এরকম কটু কথা মা কখনও কাউকে বলতে পারে তার ধারণাতেও ছিল না। টিউশনে গিয়ে মার হয়ে প্রতীকের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল সৌমি। বলেছিল— 'তুই কিছু মনে করিস না। আমার মা এরকম না। হঠাৎ সেদিন যে কেন এত চটে গেল....।' প্রতীক বলেছিল— 'ছেড়ে দে, ঠিকই তো বলেছেন আন্টি। আমি কি তোর যোগ্য?' শুনে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল সৌমি। বলেছিল— 'সেটা কি মা ঠিক করে দেবে নাকি?'

সৌমি ভালোই জানে, তাকে ব্যাঙ্গালোরে পড়তে পাঠানোর পেছনে মার একটু বাড়তি উৎসাহই ছিল। নয়তো ব্যাপারটা মা ঠিক ঠেকাতে পারছিল না। একদিন সৌমিকে খোঁচা দিয়ে বলেছিল— 'তোর এত বুদ্ধি নিয়ে তুই কি ওদের হোম-সার্ভিসের খাবার বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়াবি?' সৌমি বলেছিল— 'তাতে তোমার কি? কোনও কাজই তুচ্ছ নয়।' মা সপাটে বলেছিল— 'চুপ কর। খালি লম্বা লম্বা কথা!'

ঘটনার তিন-চার বছর পর এখন সৌমির মনে হয়, মার কথাগুলো সব ঠিকই ছিল। প্রতীকের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরো কেটে যায়নি বটে, মেসেজ চালাচালি প্রায়ই হয়, কিন্তু সৌমি নিজেই বুঝতে পারে, আগের টানটা আর নেই। নাঃ। মা ঠিক। ওকে বিয়ে করা যায় না।

কিন্তু সৌমিকে যেটা আজও ভাবায়, সেটা হল, মা অত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল কি করে?

মার নিজের জীবনে কি কোনও সিক্রেট ব্যাপার আছে?

বাপির সঙ্গে মার কি রিলেশান, যাকে বলে। চলেব্‌ল্‌। কিন্তু কোথাও যেন একটা দূরত্ব আছে। সেটা ঠিক দেখা যায় না। ছোঁয়া যায় না। কিন্তু বোধ করা যায়। তাও খুব স্পষ্ট নয়। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত সৌমির মনে হয়েছে, এই ঘর, এই সংসারের বাইরে মার কোনও নিজস্ব জীবনও নেই।

ধাক্কাটা সে খেয়েছে মার মোবাইল ফোনে ওই মেসেজটা দেখার পর।

আরও ধাক্কা খেয়েছে মার থমথমে কণ্ঠস্বরে— 'আমার পার্সোনাল মেসেজ। তুমি পড়লে কেন?'

মা এইভাবে কথা বলতে পারে ধারণাই করতে পারেনি সৌমি। যেমন ভাবতে পারেনি, মা প্রতীককে এত রূঢ়ভাবে বলতে পারে— 'এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেব।' মা কখনোই এত

থমথমে নয়, আবার এত উগ্রও নয়।

দু-বারই তাই মার সামনে গুটিয়ে গিয়েছে সৌমি। এবং সে মনে করে, এটা তার ডিফিট। কোথা থেকে এত সাহস পাচ্ছে মা?

আচ্ছা... বাপি কি এসব কিছু জানে? প্রতীকের ব্যাপারটা তো নিশ্চয়ই রিপোর্ট করেছে মা। যদিও বাপি নিজে তাকে কোনওদিনই বলেনি কিছু। কিন্তু নিজের ব্যাপারটা?

এখন সারাদিন বাড়িতে মা একা। ঠাম্মিও নেই। কি করে তাহলে সারাদিন? তার স্কুলের বন্ধু মুনিয়া বলত— 'আমার মা, জানিস তো, চান্স পেলেই ঘুমোয়।' ঠিকই ওইজন্যই তো এত মুটি। মা সেসব কিছু করবে না। ঘড়ি ধরে যোগব্যায়াম করে, মেপে খায়, মেপে ঘুমোয়, পার্লারে যায়, ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত স্ক্র্যাপ করে। কাজ কিছু থাক না থাক, সন্ধের পর সেজেগুজে হাঁটতে বেরোয়। আগে কখনও কখনও সৌমি থাকত। এখন তো একাই। বালি ব্রিজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নাকি দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত চলে যায়। মন্দির দেখে নমস্কার করে বটে, কিন্তু প্রায়ই সেখানে যায়, এমন নয়। দুই আলমারি ভর্তি মার শাড়ি আর সালোয়ার। চটি আর জুতো মিলিয়ে প্রায় সাত-আট জোড়া। সৌমির কেমন মনে হয়েছে, বাপির সঙ্গে গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে হাঁটলেই মাকে বেশি ভালো লাগে। রাস্তার লোক আড়ে আড়ে মাকেই দেখে। মা অবশ্য কাউকেই দেখে বলে মনে হয় না। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি আছে মার। মনে হয় সবাইকেই দেখছে, কিন্তু আসলে কাউকেই দেখছে না।

দূরত্ব বোধহয় একটা প্রেক্ষিত তৈরি করে। এই তিনবছর ধরে বাইরে থেকে থেকে মার কথা খুঁটিয়ে ভেবে ভেবে সৌমির মনে হয়েছে, মাকে ও যতটা অর্ডিনারি মনে করত, ততটা অর্ডিনারি বোধহয় মা নয়। তার অন্য বন্ধুদের মায়েদের থেকে বোধহয় একটু অন্যরকমই। মুন্নির মা তো শুধু মুটি নয়, পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলোতে ছাতা ফেলে দিয়েছে, বসুন্ধরার মা সাজে বটে, কিন্তু কোনও সেন্স নেই। শাড়িটা হয়তো দামি, এদিকে পায়ে একজোড়া ফেতি চটি। কাজরীর মা-র শুধু বক্‌বক্। এদের থেকে সত্যিই তার মা অন্যরকম। এই মা সৌমির গর্ব, আবার তার ঈর্ষা, তার যন্ত্রণা।

... কে মেসেজ করে তার মাকে?

কিংবা শুধুই কি আর মেসেজ করে? তখন না হয় সৌমি ছিল। এখন তো বাড়ি ফাঁকা। গড়ের মাঠ। আরও কি কি করে কে জানে। একেকসময় সৌমির মনে হয়, প্রতীককেই বিয়ে করে মাকে আচ্ছা টাইট দিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা হয় না। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে লাভ কি?

... শিট্!

বিছানার ওপর তড়াক করে উঠে বসল সৌমি। মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগল। ... এনগেজড্। নিজের

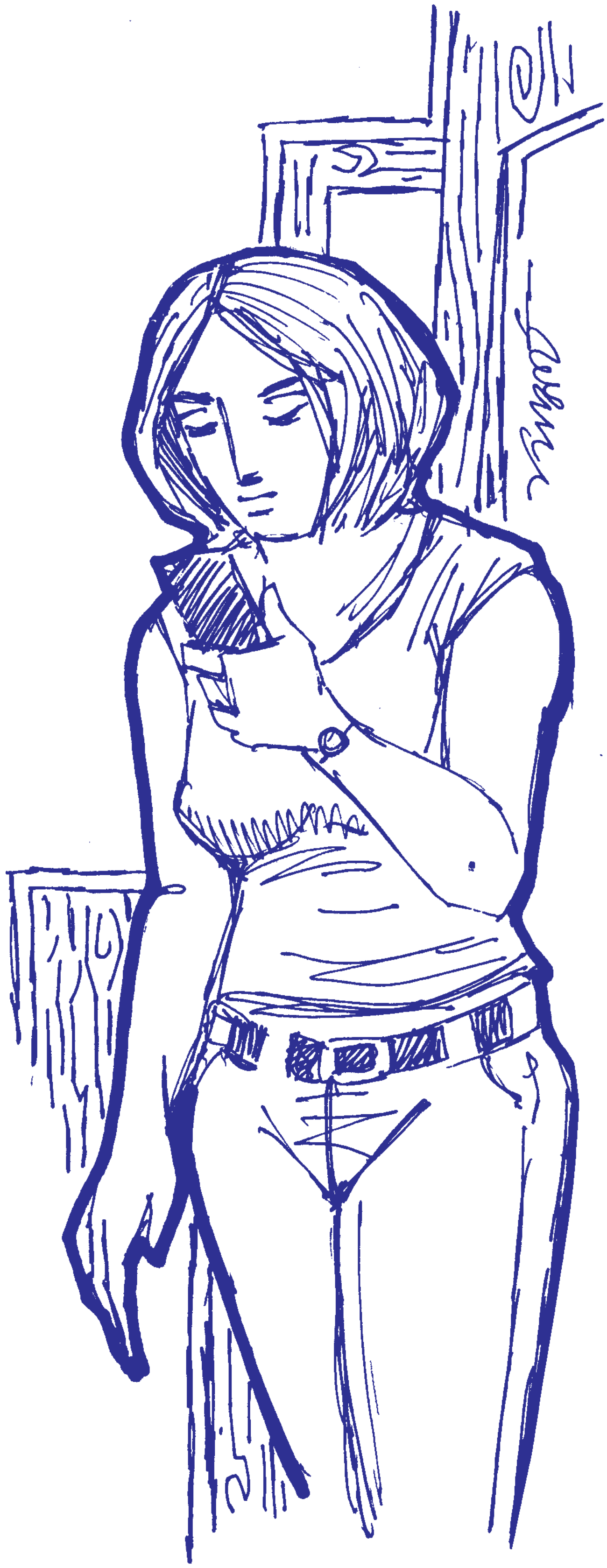

M K Points

A UP COMING WORLD-CLASS (B+G+7 STORED)
OFFICE BUILDING, IN THE HEART OF THE CENTRAL
BUSINESS DISTRICT, ON 27, BENTINCK STREET,
KOLKATA - 700 001

By

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

Ph. 03322483613

With Best Compliments From :-

Ecomoney
your green money
INSURANCE BROKERS PVT. LTD.

2A, Shakespeare Sarani, 2nd Floor, Kolkata - 700 071

Landline : 033 40265656, Customer Care No. 18001023332

মনেই একটা গালি দিল সৌমি। কাকে সে নিজেই জানে না। আর পরক্ষণেই টুংটাং করে পিয়ানো বাজতে শুরু করল তার ফোনে। ঝুঁকে পড়ে স্ক্রীনটা দেখল সৌমি। রিং ফ্রম রিংকি। মানে মা।

— 'কি করছিলি? লাইনটা এন্‌গেজড পাচ্ছিলাম?'

— 'কিছু না। তোমাকেই ট্রাই করছিলাম।'

— 'শরীর ঠিক আছে তো? ট্রেনিং ঠিক চলছে?'

— হুঁ... চলে যাচ্ছে।'

— 'শোন্, দাদা তোর মেল পেয়েছে।'

— 'ওঃ। তুমি জানলে কি করে?'

— 'একটু আগে ফোন করেছিল। তারপরই ভাবলাম, তোকে করি।'

— 'বাপি নেই? আজ তো সান্‌ডে।'

— 'নাঃ। ওদের অফিসের নতুন কি একটা ব্রাঞ্চ খোলা হবে বর্ধমানের দিকে কোথায়। সাইট ইন্সপেকশানে গেছে।'

— 'তার মানে তুমি বাড়িতে একা?'

— 'এ আবার কি কথা! দোকা কোথায় পাব?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল সৌমি। বলল— 'না, তাই বলছিলাম।'

— 'ভেবেছিলাম, তুই আসবি, তাও তো হল না।'

আবারও দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল সৌমি। বাড়িতে গেলে এখনও যে মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ আছে মার শরীরে।

— 'তুমি একা আছ তো?'

— 'আশ্চর্য! বারবার এটা কি জিজ্ঞেস করছিস? কিছু বলবি?'

লুজ বল হয়ে গেল, জিভ কাটল সৌমি।

বলল— 'না, এমনিই।'

— 'তুই প্লেসমেন্টে বসছিস তো?' — মার স্বরে একটু উদ্বেগ।

সৌমি শুকনো গলায় বলল— 'সে তো কথা হয়েই গিয়েছে।'

— 'দেখিস বাবা, এখনই যেন ফরেন ফরেন করে লাফাস না। দাদাকে পাঠাতে এত খরচ হয়েছে!'

— 'ও কবে ফিরছে?'

— 'কি জানি! ওর কথার কি কিছু ঠিক আছে? কোর্স তো কমপ্লিট। মাস্টার্স ডিগ্রি পেয়ে গেছে। এখনই আসবে, না, আরও কিছুদিন থাকবে.... আমি অবশ্য বলে দিয়েছি, থাকতে হয়, যেভাবে পারো নিজের পয়সায় থাকো।'

— 'ওকে বলোনা, ওখানেই চাকরি নিয়ে আমাকে কিছু টাকা পাঠাক।'

— 'তুই ব'ল। আমি কি বলব?'

— 'আর নয়তো, তুমি নিজেই একটা চাকরি নাও।'

— 'আমি! আমাকে কে চাকরি দেবে? আধবুড়ি।'

— 'নিজেই তো বলো, বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছ।'

— 'তা তো হচ্ছিই। সারাদিন টিভি আর ফেসবুক, সন্ধেয় একটু হাঁটা, টুকটাক মার্কেটিং, ব্যস। আর কি?'

সৌমি মুখ টিপে একটু হাসল। বলল— 'আর কিছু না?'

— 'মানে? আর কি করব? নাচব না গাইব?'

— 'তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখোনা।'

মা সামান্য চুপ করে রইল। তারপর বলল— 'আর যদি কিছু করিই, তাতে তোমাদের কি?'

সৌমি আবারও একটু হাসল। নিঃশব্দে। শিকার ফাঁদে পড়েছে।

পরের বলটা একটু ঝুলিয়ে দিল সৌমি। বলল— 'নাঃ। আমাদের আর কি?'

— 'কথাটা মনে রেখো। তোমাদের তো ফাঁকি দিচ্ছি না। তোমাকে না, দাদাকে না, বাপিকেও না।'

সৌমির চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। ঝেড়ে বাউন্সার দিল একটা।

বলল— 'ফাঁকি না দাও, ঠকাচ্ছ তো!'

— 'ঠকাচ্ছি!'

— 'অফ কোর্স। .... তুমি অস্বীকার করতে পারো, তোমার ওটা লাভ-মেসেজ নয়?'

ভেবেছিল, মা চিৎকার করে বলটা বাউণ্ডারিতে পাঠাবে। কিন্তু তা হল না। মা অল্প ঠুকে বড়জোর একটা শর্টরান নিল।

বলল— 'বেশ। তাই যদি তোমাদের মনে হয়, তোমাদের সংসার ছেড়ে চলে যাব।'

সৌমি মুচকি হাসল। নিঃশব্দে। বলল— 'কোথায় যাবে?'

— 'যেদিকে দু-চোখ যাবে।'

— 'এটা কিন্তু নাটক হল। তার মানে, তোমার একটা ডেস্টিনেশন আছে।'

মা কি একটু চাপা হাসল? ফোনে ঠিক ধরতে পারল না সৌমি। তবে কথা যখন বলল, তখন মনে হল, গলটা সামান্য ধরে গিয়েছে।

বলল— 'না রে সোনা, আমার কোনও ডেস্টিনেশন নেই।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে গুম হয়ে রয়ে রইল সৌমি। এখন দরকার ছিল একটা ঝগড়া। প্রবল একটা ঝগড়া। বাড়ি মাথায় তুলে ঝগড়া। তবে বোধহয় শান্ত হত ভিতরটা। কিন্তু উপায় নেই। ধরি ধরি করেও ধরা গেল না, কে সেই লোক? অর্ডিনারিই হোক, আর অন্যরকমই হোক, মা ওর, কারোর

সঙ্গেই সে মাকে শেয়ার করবে না, দাদাকেই পাত্তা দেয়নি। মার রূপ দেখে যে জ্বলবে, আবার রাত্রিরে মার বুকে মুখ ডুবিয়েই শরীরের গন্ধ নেবে। চিৎকার করে ঝগড়া করবে, যা মুখে আসে তাই বলবে, কিন্তু মাকে সে কোথাও যেতে দেবে না।

কিন্তু ... মা যদি নিজেই চলে যায়?

হায়! মা যে কেন পুরোটাই অর্ডিনারি হল না!

ছটফট করতে করতে আড়চোখে রুমমেট সুষমার দিকে তাকাল সৌমি। দ্যাখো! এত কিছুর মধ্যেও ভোঁস ভোঁস করে কেমন ঘুমিয়ে চলেছে।

জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সৌমি। সুষমার বিছানার পাশে গিয়ে কুৎসিত একটা গালি দিল। তারপর তার এক সময়ের ক্যারাটে শেখা চ্যাটানো হাতে ওর পশ্চাদ্দেশে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল— 'এ্যাই, ওঠ্।'

একেবারে শেষ মুহূর্তেও বড্ড দেরি করে তুলিকা।

স্কুটারে বসে দু-পা ছড়িয়ে অধৈর্য হয়ে একটা সিগারেট ধরাল জয়দীপ। হর্নটা বাজাল বারকতক। তবু সাড়া নেই। ঘড়ির দিকে তাকাল জয়। প্রায় সাড়ে ন'টা। দশটার মধ্যে তুলিকাকে ওর স্কুলে নামিয়ে সওয়া দশটার মধ্যে নিজের অফিসে পৌঁছতে হবে। বারোটার মধ্যে যেতে হবে ফ্যাক্টরিতে। অনেক কাজ। শুরুতেই এরকম দেরি হলে চলে?

বাড়ির ফলকে লেখা— গুড নেস্ট। শুনে সোহিনি বলেছিল— 'কি দারুণ নামটা রে! ভালো-বাসা।'

ভালো-বাসা! হয়তো তাই। নিজের পয়সায় নিজের হাতে করা।

এন জি ও-র কাজে সোহিনি এসেছিল ওর অফিসে, কিছুই না জেনে। ওকে দেখে চমকে উঠে বলেছিল— 'তুই! মিস্টার জে মানে তুই!'

জয়দীপও হাসছিল। বলেছিল— 'হ্যাঁ। পথ-শিশুদের জন্য তোর ডোনেশান চাই?'

আরও বলেছিল— 'পাঁচটার পরে আরেকবার আয়। তোকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে। মা খুব খুশি হবেন তোকে দেখলে।'

— 'কোথায় তোর বাড়ি?'

— 'সুন্দরগড় স্টিল সিটির বাইরে বকুলপুর।'

— 'যেখানে পঁচিশ বছর আগে আন্টিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলি? সে তো অনেক দূর।'

— 'তখন অনেক দূরই ছিল। এখন শর্টকাট রাস্তা হয়ে গিয়েছে। মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। চওড়া পিচ রাস্তা। চল্‌না?'

— 'না রে, এবারে হবে না। ডাউন আড়াইটের স্টিল সিটি এক্সপ্রেসে কলকাতার টিকিট কেটে এসেছি। তখন তো আর জানতাম না, মিস্টার জে মানে তুই! বহুৎ দেনেওয়ালা পার্টি শুনে দুম করে চলে এসেছি। এখন আবার তোকে দেখে হাত পেতে টাকা নিতে লজ্জাও করছে।'

— 'লজ্জার কি আছে? তোদের তো নোবেল কজ। আমাকেও তোদের মেম্বার করে নে না!'

সোহিনি কয়েক মুহূর্ত অবাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'তোকেও!'

— 'কেন? আরও কেউ ধরেছে নাকি তোকে?'

— 'ধরেছে মানে! ঝুলোঝুলি করছে।'

— 'কে?'

সোহিনির মুখটা একটু গম্ভীর দেখাল। বলল— 'নেহাৎই শুনতে চাস কে সে?'

— 'বল না।'

সোহিনি বলেছিল— 'রিংকা।'

— 'রিংকা!'

কয়েক মুহূর্ত হয়তো লেগেছিল ধাক্কাটা সামলাতে। তারপর জয় জানতে চেয়েছিল— 'কেমন আছে রিংকা?'

সোহিনি উত্তর দিয়েছিল— 'মন্দ কি! বাড়ি-গাড়ি-স্বামী-ছেলে-মেয়ে— যা যা থাকলে মানুষ সুখী হয়, তার সবই আছে।'

— 'তাহলে?'

— 'শুধু দুটো দুঃখ। হাতে কাজ নেই, শুয়েবসে আর সময় কাটে না। স্বামী ব্যস্ত, ছেলে ইউ এস এ-তে, মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে।'

— 'একটা তো বুঝলাম, অন্যটা?'

— 'সেটা তোকে নিয়ে।'

— 'আমাকে নিয়ে!'

— 'হ্যাঁ। ওর ধারণা, ওরই জন্য তোর জীবনটা নষ্ট হয়েছে।'

....নষ্ট!

নষ্ট হয়েছে কি আর বলা চলে? গুড নেস্ট, মানে ভালো-বাসা, যেখানে সে থাকে।

— 'আজ সকাল পর্যন্ত আমারও সেই ধারণাই ছিল।'— সোহিনি একটু একটু হাসছিল। — 'এখন অন্যরকম লাগছে।... হ্যাঁরে, বাড়ি তো করেছিস, বিয়ে করেছিস তো?'

— 'লাস্ট ইয়ারে।'

— 'সে কি রে! এতদিন পরে! বসে বসে কি করছিলি? রিংকার ধ্যান?'

— 'বিজনেস তো, দাঁড় করাতে সময় লাগে।'

— 'বাজে বকিসনা,... বাচ্চাকাচ্চা?'

জয় মাথা নাড়ল— 'হয়নি।'

— 'তোর বউ?'

— 'ওর নাম তুলিকা। ওর বাবা মিস্টার পাণিগ্রাহী সুন্দরগড় স্টিল প্ল্যান্টেরই স্টাফ ছিলেন। আর তুলিকা সুন্দরগড় সেন্ট জোসেফ স্কুলের প্রিন্সিপাল।

— 'ওরে বাবা! হেড দিদিমণি!'

জয় একটু হেসে মাথা নাড়ল।

— 'রিংকার কথা আবার ওকে বলিস-টলিসনি তো?'

— 'বলতে হয়নি। ধরে ফেলেছিল।'

— 'কি করে?'

টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একটা সাদা খাম সোহিনির হাতে তুলে দিল জয়। বলল— 'খুলে দ্যাখ।'

ছবিটা রঙিন। রঙ একটু বিবর্ণ হয়ে এলেও ঠিকই চেনা যায়। রিংকা। ববড় চুল ঘাড় পর্যন্ত। পরণে একটা মিডি স্কার্ট, পায়ে হিল জুতো। পশ্চাৎপটে সুন্দরগড়ের কোয়েল নদী।

একটু হেসে সোহিনি ফটোটা ফেরত দিল। বলল— 'ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে তোকে বক দেখাচ্ছে কেন? আবার মুচকি হাসছে।'

— 'ওটা বক দেখানো নয়। ভাব। তার আগে সাতদিন কাট্টি, মানে আড়ি চলছিল আমাদের।'

— 'বাব্বাঃ! পারিসও। সাধে কি আর তোদের বলতাম, রোমি আর জুলি!'

ছবিটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে জয় বলল— 'এখন আমি ছবিটাকে একটু অন্যভাবে দেখি। মনে হয়, রিংকা শুধু আমাকে ভাব বলছে না, বলছে, বেস্ট অফ লাক। ... বিশ্বাস কর, যখনই কোনও প্রোজেক্টে হাত দিই, ছবিটা একবার দেখে নিই। আর লেগেও যায়।'

সোহিনি খুব খানিকটা হাসল। তারপর বলল— 'বউকে এতসব বলে দিসনি তো?'

— 'নাঃ। তবে যেটুকু বলার বলেছি।'

— 'শুনে কি বলল?'

— 'যা সবাই বলে। ... আমাকে ঠকিয়েছ।'

সোহিনি সামান্য চিন্তিত মুখ বলল— 'কাজটা কি ভালো করলি!'

— 'ভালোমন্দ জানি না। প্রত্যেকের একটা প্রাইভেট লাইফ থাকতেই পারে। তারপর থেকে ছবিটা অফিসে নিয়ে রেখে দিলাম।'

— 'ঠিক আছে, উঠি রে।'

— 'আরে দাঁড়া, চেকটা নে। চা বলেছি, খেয়ে যা।'

— 'রিংকাকে তোর ফোন নাম্বারটা দিতে পারি তো?'

— 'দিস্। .... মাঝে মাঝে ফোন করলে ভালোই লাগবে।'

ওঠার সময় সোহিনি একটু চিন্তিত মুখে বলেছিল— 'কি জানি বাবা, তোদের ভালো করলাম, না মন্দ করলাম।'

কথাটা হয়তো ঠিক। ভালো হল, না মন্দ হল? জয় নিজেও বোঝে না। রোজই ফোনে কথা হয় ওদের। কথা না বলতে পারলে, মেসেজ। সকালে উঠেই সে মেসেজ করে— রিংকা.. রিংকা... রিংকা..। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্টা মেসেজে আসে— জয়... জয়... জয়...। অথচ সে বিবাহিত, রিংকাও পরস্ত্রী। তবুও কি টান! কি উত্তেজনা! কি আনন্দ! বাংলায় কি একেই বলে পরকীয়া? যার রস এত ঘন, এত মদির।

— 'আয়্যাম সরি।'

কানের কাছে শব্দটা শুনে চমকে উঠল জয়। তুলিকা। মাথায় হেলমেট বাঁধছে।

মিনিটখানেকের মধ্যে বাইকটা ছুটতে শুরু করল। কানে তখনও বাজছিল শব্দটা। ... আয়্যাম স্যরি। ... আরও কে একজন যেন বলেছিল কথাটা!

ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, গত বছর কটকের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে প্রাক্তন ছাত্র এবং সফল শিল্পপতি হিসেবে ওকে যেদিন সংবর্ধনা দেওয়া হল, সেদিনই অভিনন্দনের বন্যার মধ্যে হঠাৎই এসেছিল ওই বেসুরো মেসেজটা। তার মানে, একটা দুঃখ রিংকা আজও তার মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। এখনও সে মনে করে, তারই জন্য জয়ের ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আটকে গিয়েছে।

ভাবনাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। তবুও জয় সেদিন ওকে পাল্টা মেসেজে লিখেছিল— 'দূর পাগলি!'

রিংকার বিয়েটা সে মানতে পারেনি। খুব লেগেছিল। পড়াশুনোর সেখানেই ইতি। তা বলে ওর বিয়ের দিনে ওড়িয়া ছেলেরা যে গোলমালটা করেছিল, তাতে তার কোনও মদতই ছিল না। সে তখনও কটকের কলেজ হোস্টেলে। শুনেছিল, পুলিশও নাকি ডাকতে হয়েছিল। লজ্জার ব্যাপার। এভাবে বর আর বরযাত্রীদের সামনে...। কিন্তু এ ব্যাপারে তার যে কোনও হাতই ছিল না, সেটা রিংকার মা-বাবা বিশ্বাসই করেননি। মেয়েকেও ভুল বুঝিয়েছিলেন। যেন সে হিন্দি সিনেমার ভিলেন। খুব খারাপ লেগেছিল তাকে দেখেই যখন শাড়ির আঁচল জড়িয়ে নিজেকে ঘরের ভেতরে দ্রুত সরিয়ে নিয়েছিল রিংকা। সোহিনিকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল— 'ওদিকে আর তাকাস না। ওর পেটে বাচ্চা আছে।'

— 'বাচ্চা!'

চকিতে মনে পড়েছিল, বিয়ের সেই ওদের শেষ দেখা। সেদিন দুপুরেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা। চতুর্দিকে অকাল রাত্রির অন্ধকার। ঝড় উঠছে। ফাঁকা কোয়াটার্সের জানালা দরজা বন্ধ করছিল জয়। বাবা স্টীল প্ল্যান্টের ডিউটিতে, আর মা

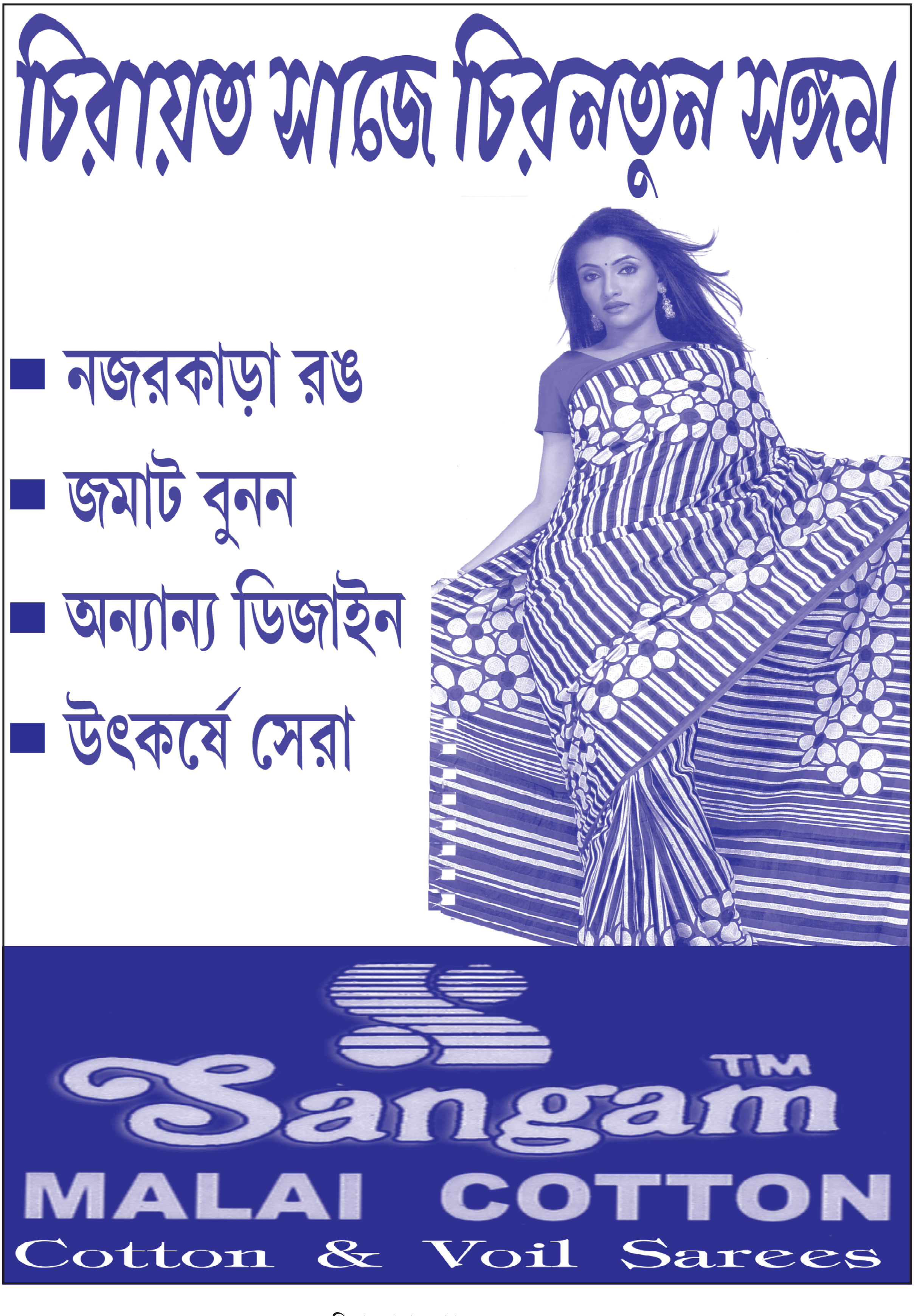

চিরায়ত সাজে চিরনতুন সঙ্গম
নজরকাড়া রঙ
জমাট বুনন
অন্যান্য ডিজাইন
উৎকর্ষে সেরা
Sangam TM
MALAI COTTON
Cotton & Voil Sarees

ক'দিনের জন্য বাপের বাড়িতে, বালেশ্বরে।

তারই মধ্যে দরজায় টুকটুক শব্দ। জিজ্ঞেস করলে কোনও উত্তর নেই। দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই ঝড়ের ঝাপটায় যেন তার বুকের এসে আছড়ে পড়েছিল রিংকি। অবাক হয়ে জয় বলেছিল— 'তুই!' মুখে হাত চাপা দিয়ে রিংকি বলেছিল— 'চুপ! আমাদের বাড়িতেও এখন কেউ নেই।'

আর তক্ষুনিই ঝড়ের দাপটে সারা পাড়া অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে কোনওক্রমে রিংকিকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল জয়। তারপর নেমেছিল অঝোরে বৃষ্টি। শুধু আকাশ জুড়ে নয়, দুজনের সারা শরীর জুড়েও।

তাকে পাগল করে দিয়েছিল রিংকি। ওর ডান কাঁধে মারাত্মক একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছিল জয়। কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল রিংকি। অনেকক্ষণ পর বিদ্যুতের ঝলকে দেখেছিল, তার দিকে চেয়ে রিংকি হাসছে। অস্ফুটে বলছে— 'এ আমার কি করলি বলতো! আমার যে বিয়ে!'

ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি কমে এসেছে। বাইরে এবং ঘরেও। জুড়িয়ে আসছে দুটি নিরাবরণ শরীরের উত্তাপ। তবুও দুজনে ছাড়েনি দুজনকে। আদিম গুহার মতো অন্ধকার ঘরে যেন দুই গুহামানব-মানবী। শুধু দেয়ালঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে সময় গুণে যাচ্ছিল। অন্ধের মতোই হাতের স্পর্শে জয় বুঝেছিল, রিংকির ডানদিকের কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ফোঁটা।

— 'হোয়াট ননসেন্স! আর ইউ ব্লাইন্ড?'— তুলিকার আচমকা ধমকে চমক ভাঙল জয়ের।

এই রাস্তার অন্ধিসন্ধি তার মুখস্থ। তবুও একটা স্পিডব্রেকারে আচমকা ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল বাইকটা। পেছনে বসে থাকা তুলিকার মোটাসোটা শরীরটা জোরে এসে ধাক্কা মারল তার পিঠে। মুহূর্তের জন্য টলে যাওয়া ব্যালান্সকে দ্রুত সামলে নিল জয়।

সে জানে, তুলিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনওদিনই স্বাভাবিক হবে না। ওরও বয়েস চল্লিশ-পার। ছোট তিন বোনের বিয়ে দিয়ে নিজে এতদিন বিয়ে না করে বসে ছিল। কেন, কে জানে। ওর স্বভাবেই একটা নীরস, রুক্ষ ভাব আছে। দীর্ঘদিনের দিদিমণিগিরি করার ফল কিনা, কে জানে! হাসে কম, কথা বলে আরও কম, কোনও বিষয়েই খুব আগ্রহ বা উচ্ছ্বাস নেই। শুধু রিংকার ফটোটা দেখে বলেছিল— 'ভেরি সুইট। বেঙ্গলি বিউটি। হোয়াই ডিডনট ইউ ম্যারি হার?'

সেসব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না জয়ের। শুধু বলেছিল— 'বিকজ আই ওয়াজ আনএমপ্লয়েড।' নিজের মুখে কি আর বলা যায়! কিভাবে ওকে অপমান করেছিলেন রিংকির মা, মীরা আন্টি! বলেছিলেন— 'প্রেম করতে হয় নিজের জাতের মধ্যে করো গিয়ে, যাও। আমার মেয়ের পেছনে লেগেছ কি চাবকে তোমাকে সিধে করে দেব।' জয় জানত, ওদের কোয়ার্টার্সের উঠোনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বললেও ঘরের পর্দার আড়াল থেকে সবই শুনেছিল রিংকি।

দু-দিন যেতে না যেতে পাল্টা শোধ তুলেছিলেন জয়ের মা-ও। বলেছিলেন— 'তুমি আসবে এ বাড়ির বউ হয়ে? তার আগে আমি গলায় দড়ি দেব। পাজি, নচ্ছার মেয়ে, রূপ দেখিয়ে আমার ছেলেকে ফুসলে বেড়াও।'

কি সব গ্রাম্য কথাবার্তা! এখন এসব মনে পড়লে একটু হাসিই পায় জয়ের। এখন এসবের ধার কেউ ধারেই না। মেয়েরা ইচ্ছেমত বয়ফ্রেন্ড পাল্টায়, ছেলেরা গার্লফ্রেন্ড। এই সুন্দরগড় শহরেও লিভ-টুগেদার করে এমন ছেলেমেয়েও আছে। এছাড়া, এই ক'বছরে কত রকমের বিয়ে হল। বাঙালি-ওড়িয়া তো কোন ছার, ভিন্ন ধর্মে পর্যন্ত। সময় বদলায়, শুধু কিছু কিছু মানুষ সময়ের ফাঁকে পড়ে যায়।

কোনটা ঠিক সে নিজেও বোঝে না। এই প্রেমহীন দাম্পত্য, নাকি পরকীয়া!

গুড নেস্ট— মানে ভালো-বাসা। কিন্তু সেখানে ভালোবাসা আছে কি? নাকি, দাম্পত্যর নামে শুধুই নিময়রক্ষা?

সত্যিই, আর একটা বছর আগে রিংকির সঙ্গে যোগাযোগ হলে বিয়েটা হয়তো করতই না সে। কিই বা লাভ হল করে? শরীর-মন কোনদিক থেকেই তাদের দেওয়া-নেওয়া করার মতো কিছু নেই। শুধু আছে কিছু অভ্যাস, আর নিয়ম। এই দু-বছরে তাতেও ক্লান্তি এসে গিয়েছে। দু-জনে দু-দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। নিছকই অভ্যাসবশে কখনও মিলিত হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলিকা বলে— 'ছাড়ো, লীভ মি! গো টু হার!' পরের কয়েকটা দিন আরও নীরসভাবে কাটে।

কি হল এ জীবনে? কাউকেই পাওয়া হল না। না রিংকি, না তুলিকা।

মরিয়া হয়ে একদিন ফোন জিজ্ঞেস করেছিল রিংকিকে— 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

— 'কি কথা?'

সামান্য সময় নিয়ে জয় বলেছিল— 'তোর ছেলেটা কার?'

রিংকিও সামান্য সময় নিয়েছিল উত্তর দিতে। বলেছিল— 'হিজ ফাদারস্।'

সঙ্গে সঙ্গে জয় পাল্টা প্রশ্ন করেছিল— 'তাহলে সেদিনের ফল কি হয়েছিল?'

রিংকির স্বর সামান্য নেমে গিয়েছিল। বলল— 'ক'দিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, জানিস? তবে, থ্যাঙ্ক গড্, কিছু হয়নি।'

— 'কিছু হয়নি!'

সত্যিটা নির্মম। তবে তারও চেয়ে নির্মম সত্যি, আর কিছু

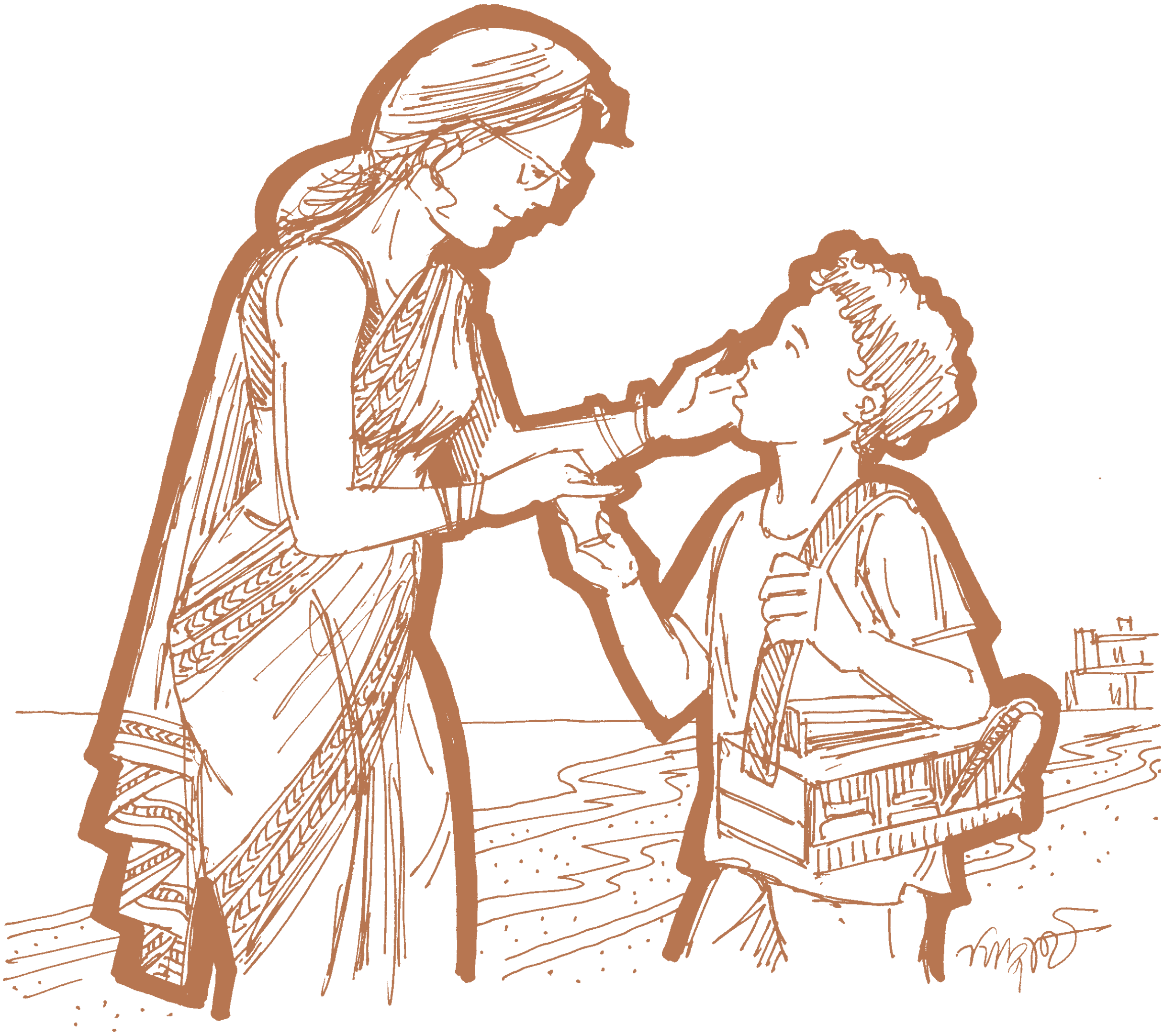

হবেও না। এই যন্ত্রণা অন্তত রিংকির নেই।

— 'তুই তোর হাজব্যান্ডকে ভালবাসিস?'

রিংকি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিয়েছিল— 'বাসি। এই তো একটু আগে ওকে মেসেজ করেছিলাম। প্রেসার আছে, সুগারও আছে একটু। অথচ দ্যাখনা, ওষুধ খেতে ভুলে যায়। তারপরেই তোকে ফোন করছি।'

বলে খিলখিল করে হাসল রিংকি। বলল— 'সত্যি, আমি কি রে? খুব খারাপ, না? না ঘরকা, না ঘাটকা।'

পাপ! পরকীয়ার পাপ! তার সমস্ত দ্বন্দ্ব, বেদনা! শুধু রসই নেই, বিষও কিছু কম না।

— 'তোর পিঙ্কির গল্প বল'— কথা ঘুরিয়েছিল রিংকি। পিঙ্কি ওর পার্টনার বিক্রমের মেয়ে।

— 'ভাবছি, ওর মতো একটা মেয়েকে অ্যাডপট্ করব।'

— 'নো।'— এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল রিংকি যে হাত থেকে মোবাইল ফোনটা আর একটু হলে পড়েই যেত জয়ের।

— 'কি হল তোর?'

পরমুহূর্তেই রিংকির গলা খাদে। কিন্তু স্পষ্ট। বলল— 'নান বাট মি উইল বি দ্য মাদার অফ ইওর চাইল্ড।'

— 'কি বাজে বকছিস?'

— 'শাট আপ।'— রিংকির গলা আবার চড়ায়— 'আই কাম ইউ। হবে না, কোনদিন বাচ্চা হবে না তোদের। আমাকে যখন দিতে পারিসনি, কোনওদিন না, নেভার, নেভার, নেভার।'

আশ্চর্য!

সেই রিংকি! যে একটু আগেই বলছিল— 'থ্যাঙ্ক গড়, কিছু হয়নি।'

বাঁকের মুখে ট্রাকটা কি হর্ন বাজিয়েছিল? ঠিক মনে পড়ে

না জয়ের। যখন সম্বিত ফিরল, বাইকটা আর সরানোর সময় নেই। হেড অন কলিশন হয়ে সে আর তুলিকা দু'জনের ছিটকে পড়ল দু'দিকে।

হাতে অনেক কাজ ছিল।

তবুও আর দেরি করা যায় না। ঘড়ি দেখল সঞ্জীব। একটা বেজে দশ। আর মাত্র কুড়ি মিনিট। লাঞ্চ করে ফিরে এসে দুটোর মধ্যে সমস্ত ফাইলপত্র রেডি করতে হবে। ঠিক দুটোয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে বোর্ড মিটিং।

একটু আগে সেক্রেটারি বিনীতা আগরওয়ালকেও সে লাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার নিজেকেও উঠতে হবে।

রুম থেকে বেরোতে যাবে, এমন সময় বেয়ারা বনমালী এসে বলল— 'রায়সাহেব, বাইরে ভিজিটরস্ লাউঞ্জে আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন।'

— 'এখন?'

— 'হ্যাঁ, সাহেব। আমি অবশ্য বলেছি লাঞ্চ পর্যন্ত বসে থাকতে।'

— 'পুরুষ না মহিলা?'

— 'মহিলা।'

.... মহিলা! .... তবে নিশ্চয়ই রিংকি নয়। ওকে এরা চেনে। অফিসের পার্টিতে সেদিনও দেখেছে। তাছাড়া রিংকি এভাবে অফিসে আসবেই বা কেন?

... মুস্কিল। এমনিতেই হাতে টাইম নেই। তবুও দু-মিনিটে যদি ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়া যায় তো ভালো। নয়তো লাঞ্চে গিয়ে ব্যাপারটা সে ভুলেও যেতে পারে।

সুইং ডোরটা ঠেলে লাউঞ্জে এসে চমকে উঠল সঞ্জীব। বলল— 'তুমি!'

মহিলা সোফা থেকে উঠে মুখে একটু হাসির ভাব এনে বললেন— হ্যাঁ রে, আমি! ছোটমামি। চিনতে পারছিস না নাকি'?

ভীষণই বিরক্ত বোধ করল সঞ্জীব। হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করল— 'না, চেনার কি আছে?'

সত্যিই তো, না চেনার কি আছে? বরং এই মহিলাকে হাড়ে হাড়ে ওরা সকলেই চেনে। মেসো ভদ্রলোক ছিলেন। মারা গেছেন। একটাই মেয়ে। বুলা। বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা অটো ড্রাইভারকে বিয়ে করে যাদবপুর না বাঘাযতীনের দিকে কোথায় যেন থাকে। তবু ভালো, কাউকে জ্বালাতন করে না।

ছোটমামি তার ঠিক উল্টো। সবসময়ই তার অভাব, আর অভাবের গল্প ফেঁদে আত্মীয়দের কাছে টাকা চেয়ে বেড়ানোটা তার স্বভাব।

— 'তুমি এভাবে অফিসে?...'

— 'রাগ করিস না। উত্তরপাড়ায় তোর বাড়িতেই গিয়েছিলাম। তোর বউ তো... যাক্‌গে, আমাকে কিছু টাকা দে না। মন ভালো নেই, ভাবছি তীর্থে যাব।'

ডেভিড অ্যাণ্ড কোলম্যান কোম্পানির জাঁদরেল অফিসার বাহান্ন বছরের সঞ্জীব রে স্রেফ হাঁ হয়ে গেল। এত নির্লজ্জ কেউ হতে পারে! অফিসে এসে টাকা চায়! ভাগ্যিস সবাই এখন লাঞ্চে, রিসেপশান ডেস্কে ডোনা আর অ্যালিসও এখন নেই, ওরাও তো বাংলা ভালোই বোঝে!

— 'তীর্থে যাবে মানে?'

— 'দেখি, কোথায় যাই। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, না হলে পুরী। বড়দি, মেজদি, ছোড়দি সবাই চলে গেল, পড়ে রইলাম শুধু আমি!'

রাগের মধ্যেও সঞ্জীবের হাসি পেল। ছোটমাসির বয়স মেরেকেটে ষাট। মায়ের সব ভাইবোনদের মধ্যে ছোট। তার তো পড়ে থাকারই কথা। এবং এখনও অনেকদিনই থাকবে। চেহারা এবং সাজগোজে খুব একটা দৈন্যের ছাপও নেই।

— 'হাজারখানেক দে, চলে যাই। তুই নিশ্চয়ই ব্যস্ত।'

এখনও হাঁ হয়েই রইল দুঁদে অফিসার সঞ্জীব রে। ... এই মহিলা ভেবেছেটা কি? এইভাবে দিদিদের প্রত্যেককে শোষণ করে এখন তাদের ছেলেমেয়েদের ধরেছে। এরই জন্য মায়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। এরই জন্য একদিন রেগে গিয়ে মার ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকবই সব ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে গিয়েছিল সঞ্জীব। তখন রিংকিই বাধা দেয়। মা আর নেই। এখন এসব মনে পড়লে একটু অনুতাপই হয় সঞ্জীবের।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল সঞ্জীব। দেখতে দেখতে পাঁচটা মিনিট কেটে গিয়েছে। তাড়িয়ে দিলে এই মহিলা কি ওর অন্য ভাইবোন দীপু-মণিদের অফিসেও হানা দেবে নাকি? কিছুই বিচিত্র নয়। টাকার জন্য মাসি সব পারে।

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সঞ্জীব। বলল— 'শোনো, ছোটমাসি। এটা অফিস। এখান থেকে আমি কাউকে টাকা দিই না। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এখানে আসবে না। আর... আমার বাড়িতেও যাবে না।'

— 'ঠিক আছে।' — সোফা থেকে উঠে পড়ল ছোট মাসি। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব। পাকা শয়তানের লক্ষণ আর কি! মনে মনে কোন ফন্দি আঁটছে।

— 'চলি রে' বলে বেরিয়ে যেতে যেতে আবারও ঘুরে দাঁড়াল ছোটমাসি। বলল— 'কাবেরী কাঁদে কেন রে?'

TODI INVESTORS

Automobile Financers
&
Estate Developers

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020

Phone : **23025160-5**
Fax : (033) 2287-6329
e-mail : opagarwala@gmail.com

With Best Compliments From :-

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020
Phone : 2302-5250 / 3 /4
Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329

E-mail : peivik@vsnl.net / scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- **M/s. Motor Industries co. Ltd.**
- **M/s. Bosch, GMBH-Germany**
- **M/s. Deutz, A. G., Germany**
- **M/s. Lombardini - Italy**
- **M/s. V. M. Motori - Italy**

— 'কে কাবেরী?'

— 'রিংকি রে রিংকি। তোর বউ। ভালো নামটাও ভুলে গেলি?'

— 'ওঃ। .... কাঁদে মানে?'

— 'তাই তো দেখলাম। আমাকে দেখে দরজাটা খুলেই সরে গেল। বাথরুমে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু চোখদুটো তখনও জবাফুলের মতো লাল। ছেলেমেয়েরা তো শুনলাম ভালোই আছে। তবুও কথাই প্রায় বলতে পারছিল না। না হলে কি আর তোর কাছে অফিসে এসে উৎপাত করি?'

— 'কাঁদছিল?'

— 'শুধু কাজ কাজ করিস না। বউটাকেও একটু টাইম দে। ডিপ্রেশানের রুগি হয়ে যাবে যে!'

চটি ফট্‌ফট্ করে বেরিয়ে গেল ছোটমাসি।

কাঁদছিল! রিংকি কাঁদছিল! অথচ সকালে অফিসে বেরোনোর সময়েও তো... বলল, 'গাড়ির তেল নেই বলেছিলে, ভরিয়ে নিও।'

টাকা না পেয়ে ছোটমাসি একটা ছোবল মেরে চলে গেল নাতো!

কিন্তু, আর সময় নেই।

উর্ধ্বশ্বাসে লাঞ্চে ছুটল সঞ্জীব। তার মধ্যেই একটা ফোন করল রিংকির মোবাইলে। এন্‌গেজড্। আমেরিকায় এই সময় রাত। ও বাপ্পার সঙ্গে কথা বলছে নাতো?

হুড়মুড় করে লাঞ্চ খেয়ে রুমে এসে যখন ঢুকল, তখন একটা চল্লিশ। সেক্রেটারি বিনীতা এসে গিয়েছে, বলল— 'ফাইল রেডি করব স্যার?'

— 'অফ কোর্স।'

দশ মিনিটের মধ্যে বকেয়া কাজ সেরে নিল সঞ্জীব। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছু ভুল হল কিনা কে জানে। তাহলেই বোর্ড মিটিংয়ে বেইজ্জতি। শত্রুদের মুখ উজ্জ্বল।

রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মোবাইল ফোনটা অফ করতে গিয়ে সামান্য থমকে গেল সঞ্জীব। আর একবার ট্রাই করবে রিংকিকে? নাঃ, থাক। কথায় কথা বেড়ে গেলে খুব মুশকিল হবে।

দুটোর মিটিং শেষ হতে হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। মোটামুটি উত্তরে দেওয়া গিয়েছে। একে একে বিদায় নিচ্ছেন বোর্ডের মেম্বাররা। অফিসও প্রায় ফাঁকা। নিজের ঘরে ঢুকে বেল বাজাতেই পাশের অ্যান্টি চেম্বার থেকে বিনীতা এসে দাঁড়াল।

— 'ওকে বিনীতা, থ্যাঙ্ক ইউ, নাও ইউ মে গো।'

বিনীতা একটু হেসে পাল্টা থ্যাংকস্ দিয়ে চলে যেতেই নিজের ব্যাগপত্তর গোছাতে শুরু করল সঞ্জীব। মোবাইলটা কিছুক্ষণ আগেই চালু করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও মেসেজ নেই। তার মানে, সারাদিনেও রিংকি কোনও মেসেজ করেনি তাকে।

বাইরে বেরোতেই গরমের ছ্যাঁকা লাগল। গ্রীষ্মের দিন দীর্ঘ। এখনও আলো পুরোপুরি মরেনি। বাতির রোশনাইয়ে সেজে ওঠেনি সদাব্যস্ত পার্ক স্ট্রিট। সাধারণত সাতটার আগে অফিস ছাড়তে পারে না সে। আজকে মিটিং থাকায় বরং খানিকটা আগেই হল। রিংকি এই সময়টায় কি করে, ভাবতে চেষ্টা করল সঞ্জীব। যতদূর মনে হয়, ও এই সময়টাতে গা ধুতে যায়, তারপর সন্ধ্যাপুজো করে। 'তুমি মন্ত্র জানো?'— সঞ্জীব একবার ঠাট্টা করেছিল। রিংকি রেগে না গেলেও হাসেনি। একটু গম্ভীরভাবেই বলেছিল— 'না।' — 'তাহলে কি পুজো কর?' রিংকি বলেছিল— 'চোখ বুজে প্রার্থনা করি, সবার ভালো হোক।'

— 'মানে, আমাদের?' রিংকি যেন নিজেরই কথার প্রতিধ্বনি করেছিল— 'সবার।'

তাহলে এখন ওকে ফোন করে লাভ নেই। তার চেয়ে একটা বারে ঢুকে একটু ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়ে নেওয়া যাক। আজকে মনে হচ্ছে, রাস্তায় একটু জ্যাম আছে, পার্ক স্ট্রিট ধরে সিম-সিম করে এগোচ্ছে গাড়ি। ভেতরের গরম ভাবটা এখনও পুরোটা কাটেনি। সবে এসি চালু হয়েছে। আর একটু টাইম লাগবে। ততক্ষণ.... ড্রাইভার নীলকান্তকে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়িটা থামাতে বলে হাতে পার্কিং ফিজ গুঁজে দিয়ে মারমেড ট্যাভার্নের কাঁচের দরজার আড়ালে নীলাভ স্বপনপুরীতে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল সঞ্জীব।

সেখানে আবার একটা টেবিলে বসে স্কচ্ সাঁটছিল স্বামীনাথন। বোর্ড-এর মেম্বার। মিটিং সেরেই এখানে ঢুকে পড়েছে। হাত তুলে সঞ্জীবকে ডাকল— 'হাই।' মিটিংয়ে বস্ হলেও এখানে যে কেউ এক গেলাসের ইয়ার। স্বামীনাথন চোখ টিপল— 'চলবে?' — 'নো, ওনলি বিয়ার।'— সঞ্জীব বলল। —'ওনলি বিয়ার? হাঃ।' স্বামীনাথনের বোধহয় নেশা চড়ছিল। নিজেই বেয়ারাকে ডেকে সঞ্জীবের জন্য বিয়ারের অর্ডার দিল। সঙ্গে সল্টেড ক্যাজুনাট্‌স। টুকটাক কথাবার্তার মধ্যে দেখতে দেখতে আধঘন্টার ওপর হয়ে গেল। সঞ্জীব ঠিকই বুঝেছিল। স্বামীনাথনের মেজাজ বেশ দরাজ। দু'জনের বিলই পুরো মিটিয়ে দিয়ে হাসল— 'হাঃ।'

এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলোর মালায় সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট। গাড়িতে উঠতেই নীলকান্ত বলল— 'আজ ভোগাবে, স্যার।' — 'কেন?' — 'দু-দুটো পলিটিক্যাল পার্টির মিছিল ছিল। হাওড়া, শেয়ালদা দু'দিকেই জ্যাম।' — 'তুমি সেকেন্ড ব্রিজ ধরো।' নীলকান্ত স্টার্ট দিয়ে বলল— 'দেখছি স্যার।'

সিমসিম করে এগোচ্ছে গাড়ি। হাতঘড়ির দিকে তাকাল

সঞ্জীব। তারপর দ্রুত মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে লাগল। রিংকি বোধহয় কাছেই ছিল। দু-একবার মাত্র রিং হতেই ওর সাড়া পাওয়া গেল। — 'হ্যাঁ, বলো। ফিরছ?'

গলা স্বাভাবিক।

এই রিংকি কাঁদছিল? কেন, কাঁদবেই বা কেন? তার তো কোনও কিছুর অভাব নেই। বাড়ি, গাড়ি, স্বামী, ছেলেমেয়ে, আলস্য, অবসর— সবই তো আছে! তার সঙ্গে আছে তার নিজের নিটোল রূপ, ছিমছাম শরীর। আরও আছে আলমারি ভর্তি শাড়ি, সালোয়ার, ব্যাঙ্কের লকারে গহনা, অফুরন্ত সাজের জিনিস, ম্যাচ করা চটি, জুতো। সব মিলিয়ে এখনও সে অ্যাট্রাকটিভ... কাঁদবে কেন?

— 'হুঁ, ফিরছি। তবে দেরি হবে।'

— 'কেন?'

— 'রাস্তায় জ্যাম।'

— 'ও! আমি কিন্তু একটু বেরোচ্ছি।'

— 'কোথায়?'

— 'প্রথমে যাব রেড ক্রস মেডিকেল স্টোর্সে। সৌমির পিরিয়ডে একটু গণ্ডগোল হচ্ছে আবার। দুপুরে ওর ফোন পেয়ে ডক্টর কাঞ্জিলালকে ফোন করেছিলাম। উনি একটা ওষুধ বলে দিয়েছেন। তিরিশটা ট্যাবলেটের স্ট্রিপ। কিনে সোজা চলে যাব স্পিডি ট্র্যাক ক্যুরিয়ারে। সেখান থেকে ওষুধটা পাঠিয়ে দেব।'

... তাহলে? সবই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে কান্নাকাটি কোথায়?...

— 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো?'

— 'কি?'

রিংকি, মনে হল, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। শব্দ হচ্ছে আশপাশে।

— 'আজ ছোটমাসি এসেছিল?'

রিংকি যেন এক মুহূর্ত সময় নিল। তারপর বলল— 'হ্যাঁ, এসেছিল।'

— 'কিছু বলছিল?'

— 'টাকা চাইছিল।'

— 'তারপর?'

— 'আমি স্ট্রেট না বলে দিয়েছি।'

রিংকির স্বরে এমনই একটা স্পষ্টতা যে এরপর আর জিজ্ঞাসাই করা যায় না, তুমি কি তখন কাঁদছিলে?

— 'তারপর আমার অফিসে এসেছিল।'

— 'সে কি!'

সঞ্জীব অফিসের ঘটনাটা বলল। রাস্তার শব্দে সবটা বোধহয় পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল না রিংকি। মাঝে মাঝেই —'হ্যাঁ-হ্যাঁ। করছিল। তবুও বউয়ের কণ্ঠস্বর খেয়ালে রাখছিল সঞ্জীব। ... স্বাভাবিক। ... বেশ স্বাভাবিক।

মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে ফোন ছেড়ে দিল সঞ্জীব। গাড়ি ততক্ষণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত এসেছে। আরও একটু এগোলে সেকেন্ড ব্রিজ। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট একটা হাই তুলল সঞ্জীব। তারপর হাত দুটো ছড়িয়ে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

প্রত্যেক পুরুষই তার স্ত্রীকে স্বাভাবিক দেখতে চায়।

রিংকিও তো স্বাভাবিক। তাহলে ছোটমাসির গল্প শুনে সঞ্জীব ভেতরে ভেতরে এত উতলা হয়ে পড়েছিল কেন?

চোখ বুজে তাদের পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ছবিটাকে টুকরো টুকরো ফ্রেমে দেখবার চেষ্টা করছিল সঞ্জীব।

এটা ঠিক, সুন্দরগড়ে ওদের বিয়ের দিন সন্ধ্যায় একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। স্টিল সিটির সাত নম্বর সেক্টরের যে কমিউনিটি হলে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, তার চারপাশ নাকি বেশ কিছু ছেলে ঘিরে ফেলেছিল। এদের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতীও ছিল। ভাড়াটে গুণ্ডা টাইপ। রিংকিকে ওরা নাকি বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য তেমন কিছুই হয়নি। এরকম কিছু হতে পারে আঁচ করেই বোধহয় রিংকির বাবা-মা, আত্মীয়রা সেক্টরের থানায় খবর দিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ এসে বেছে বেছে ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোকে গ্রেপ্তার করার পরেই বাকি ছেলেগুলো পালিয়ে যায়।

কিন্তু কেন এমন একটা ঘটনা আদৌ ঘটল, তা নিয়ে রিংকিদের তরফে মুখ খোলেনি কেউই। — 'ওসব স্থানীয় কিছু ছেলের বদমায়েসি' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গুঞ্জন, ফিসফাস থেকে একটা কথা ঠিকই কানে চলে এসেছি, রিংকির কারও সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল, এসব তারই কীর্তি।

বিয়ের পর, এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে, এ ব্যাপারটা নিয়ে রিংকি একটি কথাও বলেনি। সঞ্জীবও বেশি ঘাঁটায়নি। রিংকির প্রকৃতির মধ্যে একটা আশ্চর্য গাম্ভীর্য আছে। সে যেমন সঞ্জীবের বিবাহপূর্ব জীবনের কোনও কথা জানতে চায় না, তেমনই নিজেরও অতীত নিয়ে খুব একটা কিছু বলতে চায় না। কিভাবে যেন এব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। কেউ কারও সীমানা ভাঙতে যায় না।

তাতে কি তাদের দাম্পত্যজীবনে কোনও চিড় ধরেছে?

বোধহয় না।

তবে একটা জিনিস সঞ্জীব বোঝে। নারী রহস্যময়ী। যতই আটপৌরে সাধারণ তাকে দেখতে হোক না কেন, তার মন খুব বিচিত্র পথের অনুগামী। যে রিংকি সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু সামলে রাখে, বাজার করে, দোকানে যায়, জিনিসপত্রের দামের উর্ধগতি নিয়ে গজ গজ করে, সেই রিংকির তল পাওয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার?

কিন্তু সঞ্জীব জানে, তল সে পায়নি।

যেমন, সে ভাবতে পারেনি, মার শেষ অবস্থায় রিংকি এতটাই করবে। এমনিতে সে খুব পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, অথচ মার বিছানার নোংরা পর্যন্ত ঘেঁটেছে। তা বলে মার সঙ্গে ওর সম্পর্ক যে খুব ভালো ছিল, এমন বলা যাবে না। শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্ক ভালো হবারও নয়। মা সারাজীবনের অনেক কথাই শুনিয়েছেন রিংকিকে, এমনকি তাদের বিয়ের দিনের ঘটনাটা নিয়েও খোঁটা দিতে ছাড়েননি। রিংকি কখনও প্রত্যুত্তর দিয়েছে, কখনও স্রেফ উপেক্ষা করেছে। শেষেরটায় মা আরও বেশি জ্বলে উঠতেন, তবুও রিংকিকে টলানো যায়নি। অথচ তাঁরই শেষ অবস্থায় নিজের কায়িক শ্রম এতটাই উজাড় করে দেবে রিংকি, সঞ্জীব ভাবতেও পারেনি। একবার বলেছিল— 'তোমাকে তো মা কম কথা শোনাননি, তাহলেও তুমি...।' রিংকি মশারি টাঙাচ্ছিল। সঞ্জীবকে থামিয়ে দিয়ে বলল— 'শুয়ে পড়ো। ওসব মনে করিও না। ভালোও তো বেসেছেন।'

এই রিংকি কি খুব সাধারণ?

সঞ্জীবের মনে হয়, এর চেয়ে মাকে রিংকি ঘৃণা করলে সে বোধহয় বেশি স্বস্তি পেত।

রিংকির ডান কাঁধেই বা কি আছে? কিসের রহস্য? ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছে সঞ্জীব, একটা মাঝারি মাপের তিল ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ তার সমস্ত শরীরকে সঞ্জীবের হাতে ছেড়ে দিলেও, ওখানে ঠোঁট ছোঁয়াতে গেলে রিংকি কাঁকিয়ে উঠে বলেছে— 'আঃ! ওখানটা ছাড়ো না! বলেছি না, লাগে আমার।'

কেন? লাগবে কেন?

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

রিংকির চোখদুটোও খুব অদ্ভুত। বড় বড়। কিন্তু দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যখন সে কারও দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় তাকে নয়, তাকে ছাড়িয়ে সে অন্য কাউকে দেখছে। সত্যি বলতে কি, ওর স্থিরদৃষ্টির সামনে সঞ্জীবের একটু ভয় হয়। শরীর ছমছম করে। মনে হয়, সামনে বসে থাকলেও রিংকি যেন আসলে অনেক দূরে, অন্য কোথাও অন্য কারো কাছে!

এসবের কোনওটাই কি স্বাভাবিক?

নিজের মনেই মাথা নাড়তে লাগল সঞ্জীব। স্বাভাবিক নয়। তাহলে কি ছোটমাসির কথাই ঠিক? দুপুরে একা বাড়িতে কাঁদতেও পারে রিংকি? কিন্তু কেন? কার জন্য?

জ্যামের ফাঁস পার হয়ে গাড়ি গতি পেয়েছে অনেকক্ষণ। বাড়ি পৌঁছে বেল টিপতেই নিচে নেমে দরজা খুলে দিল রিংকি। সঞ্জীব দেখল, তার চোখেমুখে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই।

টুকটাক মামুলি কথাবার্তার পর হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিল দু'জনে। সারাদিনের ক্লান্তির পর শুতে না শুতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল সঞ্জীবের। রিংকি তখনও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

মাঝরাতে একটা স্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে উঠল সঞ্জীব। রিংকি বিছানায় নেই। মেঝেতে উপুড় হয়ে কাঁদছে, কেঁদেই চলেছে। তার কান্নার শব্দ প্রতিধ্বনিও হচ্ছে রাত্রির নৈঃশব্দে।

হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল সঞ্জীব। কোথায় কি? রিংকি পাশেই শুয়ে। দিব্যি ঘুমোচ্ছে। তবুও ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের কাছে মুখ আনল সঞ্জীব। রিংকি শোবার আগে দাঁত ব্রাশ করে। আজও করেছে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসে পেস্টের সুঘ্রাণ। স্বাভাবিক... সবই স্বাভাবিক। তবুও বেডসুইচ জ্বেলে ওর মুখটা ভালো করে জরিপ করতে লাগল সঞ্জীব। পরক্ষণেই চমকে উঠল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রিংকি। ওর দু-হাত ভাঁজ করে কপালের ওপরে রাখা। কিন্তু বন্ধ চোখের নিজে দুই গালের ওপরেই জলের শুকনো রেখা।

সঞ্জীবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কাটবে না কাটবে না করেও টিকিটটা শেষপর্যন্ত কেটেই ফেলল বাপ্পা।

এদিককার কাজ কমপ্লিট। মাস্টার্স ডিগ্রি হাতে এসে গিয়েছে। ওর দুই রুমমেটের একজন কয়েক মাস আগেই দেশে ফিরে গেছে, আরেকজন অবশ্য এখনও কয়েকমাস থাকবে, পি এইচ ডি-র চেষ্টা করবে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি বাপ্পারও একটা অফ দ্য ক্যাম্পাস ট্রেনিং আছে। তার জন্য ওকে যেতে হবে টেক্সাসে। এক মাসের ট্রেনিং। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোম্পানিই করবে। ভালো অ্যালাউয়েন্সও দেবে। ডলারে যা দেবে, ইন্ডিয়ান রুপিতে তা প্রায় সাত লক্ষ। ওই টাকা ভাঙিয়ে এদেশে আরও কিছুদিন থেকে চাকরির চেষ্টা করা যেতে পারে।

মাঝে এক-দেড়মাস হাতে কোনও কাজ নেই। অতএব, এই ফাঁকে...

ফোনে অবশ্য মা সেই পুরনো কথাই তুলেছিল। — 'কি দরকার? যাতায়াতে যেখানে এত খরচা?'

মা এরকমই। খুব হিসেবি।

বাপ্পা বলেছিল— 'খরচা তো আর তোমাদের হচ্ছে না। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্সশিপের টাকাটা তো জমেই আছে। ক্যাম্পাস জব করে হাত-খরচা চালাচ্ছি। এখন এখানে সব হস্টেল বন্ধ, ক্যাম্পাসে জব নেই। এখন থাকলে বরং খরচা বেশি।'

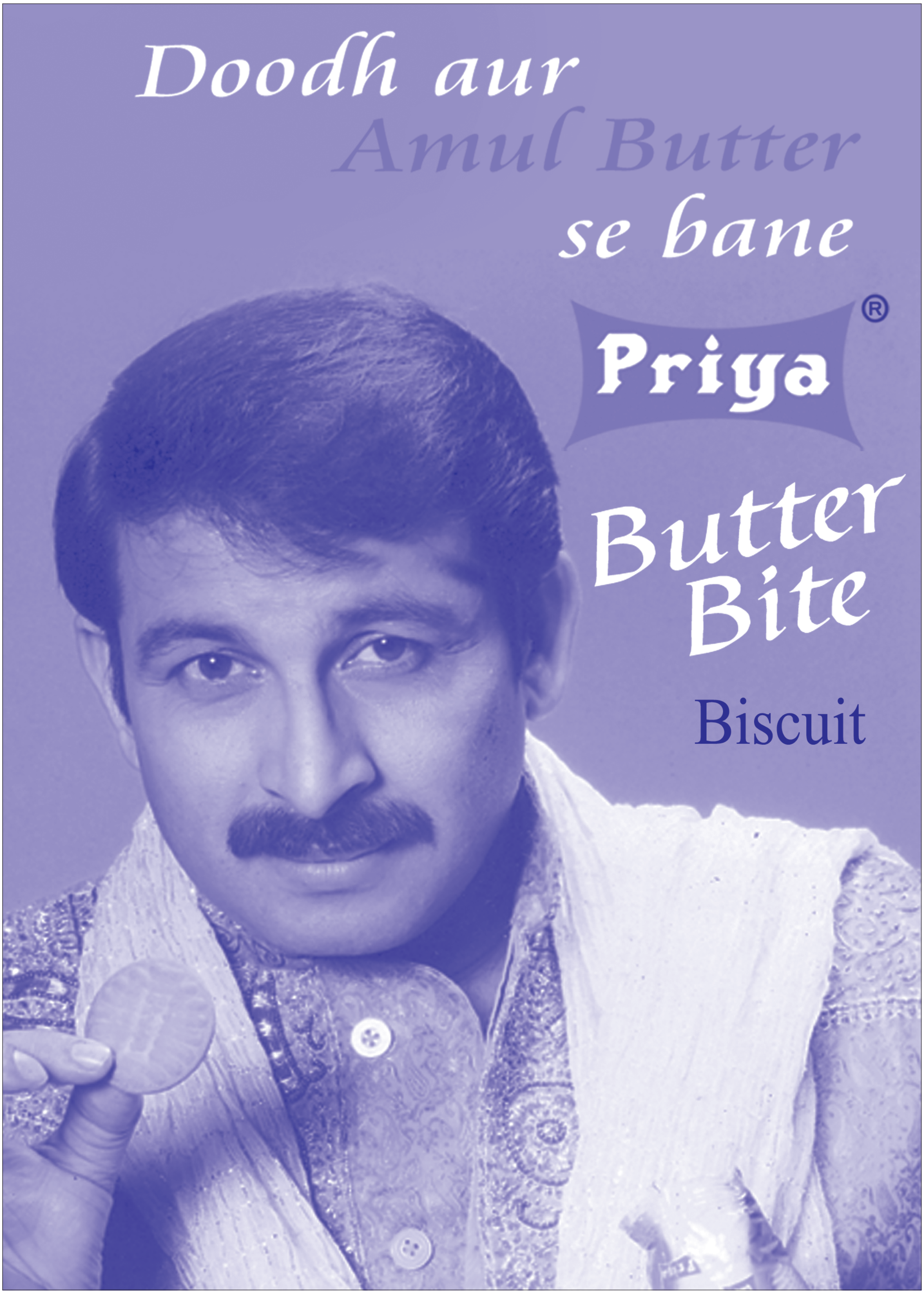
Doodh aur
Amul Butter
se bane
Priya
Butter
Bite
Biscuit

মা অমনই মনে করিয়ে দিল— 'তোর ব্যাঙ্ক লোনের ব্যাপারটা খেয়াল রাখিস। অগাস্ট থেকে কিন্তু প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। প্রায় কুড়ি হাজার। এদ্দিন তো শুধু ইন্টারেস্ট দিয়ে চলছিল।'

— 'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাত লাখ টাকা তো পাচ্ছি, তার থেকে কিছুটা দিয়ে দেব।'

— 'দিতে তো হবেই। বাপি আর কতদিন টানবে? সৌমির জন্যও লোন হয়ে গেল। হস্টেল খরচাও ধাঁ ধাঁ করে বাড়ছে.... এবছরে কত দিলাম জানিস? অ্যাবাউট নাইন্টি থাউজ্যান্ড । ভাব একবার!'

— 'হুঁ।'

— 'তার ওপর তোর মতো ফরেন যেতে চাইছে। আমি বলে দিয়েছি, সম্ভব নয়। বি টেক পাশ করে কিছুদিন চাকরি-বাকরি করো, তারপর পারলে নিজের পয়সায় যাও। নয়তো দাদাকে বলো, সে যদি কিছু হেল্প করতে পারে।'

— 'আমি? আমি কি হেল্প করব?' রুখে উঠল বাপ্পা। — 'আমার নিজেরই এখনও চাকরির ঠিক নেই।'

— 'তাই বলছিাম, একেবারে চাকরি পেয়েই নাহয় আসতি, মাঝে এসে এতগুলো টাকা খরচা....'

— 'এখানে চাকরিতে ঢুকলে একবছরের আগে ছুটি পাওয়া যায় না।' গুম হয়ে বলল বাপ্পা।

... মা যেন কিরকম! বড্ড হিসেবি, ইমোশান কম।

— 'ঠিক আছে, তাহলে...। এই তো দ্যাখ না, পেট্রলের দাম বেড়ে গেল। বাপির পক্ষে গাড়ি ছাড়া এই উত্তরপাড়া থেকে অফিস যাতায়াত করা সম্ভব না। ড্রাইভারের মাইনে, পুজোর বোনাস, তারপর ধর ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট...'

হুঁ হাঁ করে চালিয়ে দিল বাপ্পা। মাকে যে কেন ইন্ডিয়ার ফিনান্স মিনিস্টার করা হয় না!

এইজন্যই মার নিজের কিছু হল না। হিসেবের বাইরে মা এক পাও যাবে না। এখনও গাড়ি ছাড়া একা কলকাতা পর্যন্ত যেতে চায় না। অথচ ওর অনেক বন্ধুর মা-ই চাকরি করেন। ঋদ্ধির মা কলেজে পড়ান, সুমনের মা ব্যাঙ্ক অফিসার, সাত্যকির মা রেলের স্টাফ। শুধু মা-ই তেমন কোনও চেষ্টাই করল না। তবে একটাই রক্ষে। বাড়িতে শুয়ে বসে থেকে ধুমসি মুটি হয়ে যায়নি।

হয়তো এজন্যই তার বন্ধুরা বলে— 'কাকিমা স্কুলে কি কলেজে পড়ালে গার্লফ্রেন্ডদের ছেড়ে কাবেরী ম্যামের পেছনেই লুটে যেতাম।'

ঋধি বলে— 'কাকিমার হাসিটা সো সুইট! হ্যাঁরে, আঙ্কেলের সঙ্গে কি লাভ-ম্যারেজ?'

— 'ধুস্।'

মা করবে অ্যাফেয়ার! অত সাহস আছে নাকি মায়ের? বাইশ বছর বয়েসে ঘাড় গুঁজে বিয়ে।

তবে মা চোখে চোখ রাখলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মার চোখদুটো খুব বড় বড়। তবে সেজন্য নয়। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি আছে মার। মনে হয়, ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। মিথ্যে বললে এখনও এত সহজে ধরে ফেলে না।

বান্ধবী ঋদ্ধিকেই একমাত্র একথাটা বলেছিল বাপ্পা। শুনে ও বলেছিল,— 'এর কারণ কি জানিস? কাকিমা খুব পিওর। স্পটলেস। ইউ স্যুড ফিল প্রাউড অফ ইওর মাদার।'

পিওর! স্পটলেস!

তা হবে।

আসলে মা খুব হিসেবি। কোনওদিন ট্র্যাকের বাইরে যায়নি, যাবে না।

প্রিন্টার থেকে সড়সড় করে বেরিয়ে এল টিকিটটা। বেশি নয়, মাত্র দু-বার ফ্লাইট বদল। ফিলাডেলফিয়া থেকে সোজা মুম্বাই, তারপর মুম্বাই টু ক্যালকাটা। স্টার্টিং অন সেভেনথ্ জুন, রিচিং ক্যালকাটা, নাইনথ্ জুন, লোকাল টাইম সকাল দশটা পাঁচ।

এবারে সৌমিকে ফোনে ট্রাই করা যেতে পারে। ইণ্ডিয়াতে এখন রাত। ও নিশ্চয়ই ফ্রি আছে। বোতাম টিপতেই লেগে গেল লাইনটা।

— 'হ্যালো, কি করছিস?'

— 'কিছু না, নাথিং। শুয়ে আছি।'

— 'তোর ট্রেনিং কবে শেষ হচ্ছে?'

— 'এই তো পরশু।'

— 'মানে...'

— 'ফিফ্থ জুন। মনডে।'

— 'তারপর কি করবি? বাড়ি আসছিস তো?'

সৌমি একটু অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল— 'বাড়ি? দেখি।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না বাপ্পা। ক'দিন আগেও যে বাড়ি আসার জন্য হেদিয়ে মরছিল....

— 'আমি বাড়ি আসছি।'

— 'কবে?'

— 'নাইন্থ জুন।'

— 'ওঃ। .. ক'দিন থাকবি?'

— 'মাসখানেক। তোর টিকিট কেটেছিস?'

— 'কেটেছিলাম। কালকেই।

সৌমি এভাবে কথা বলছে কেন? শরীর খারাপ? নাকি মার সঙ্গে ফোনে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?

— 'প্লেনে?'

— 'হুঁ।'

— 'তোর কি হয়েছে? মা কিছু বলেছে? নিশ্চয়ই ট্রেনে তৎকাল কেটে আসতে বলছিল?'

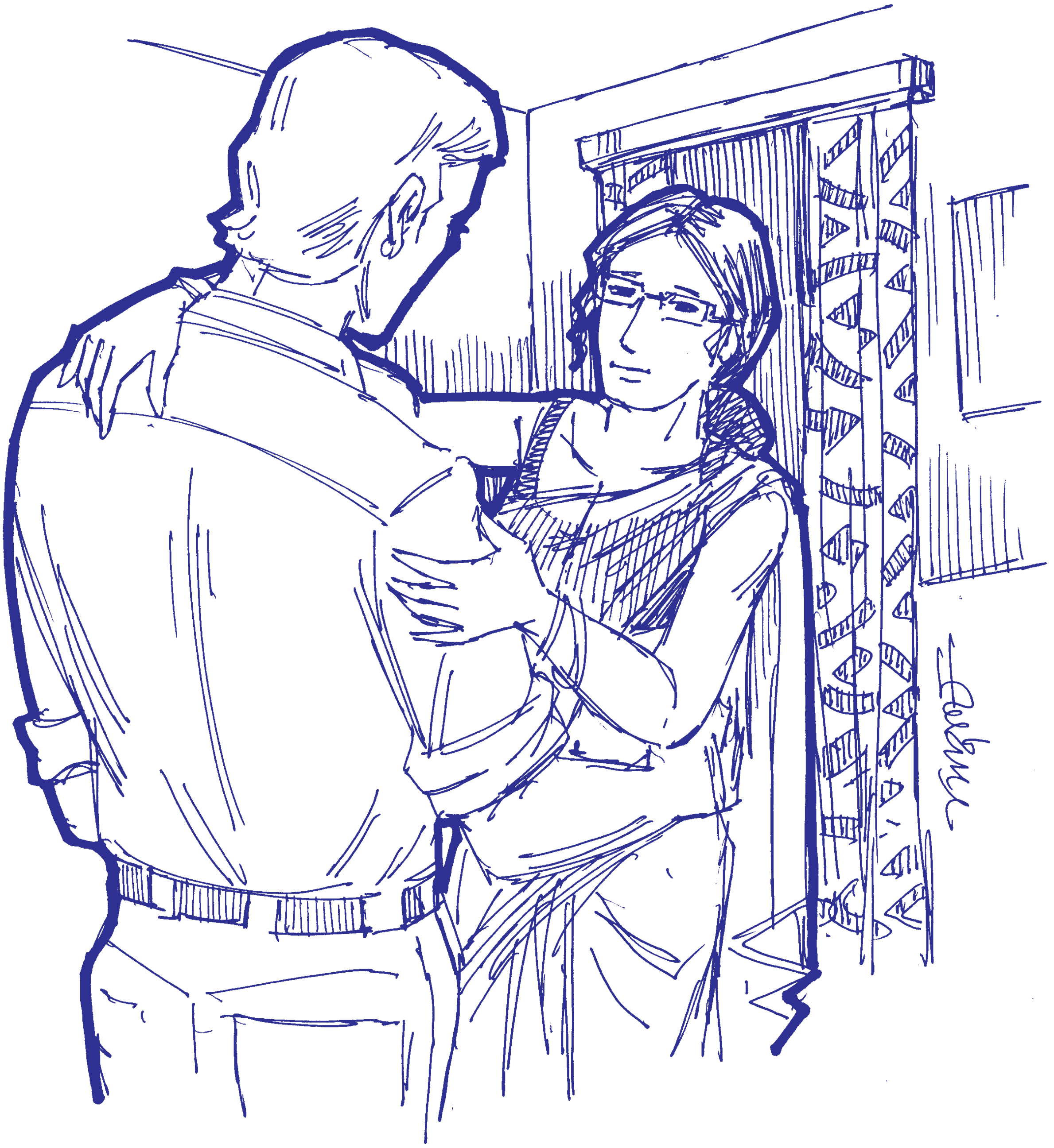

সৌমি শুকনো গলায় বলল— 'না। কিছু বলেনি মা।'

তাহলে কি হল?

মাকে খুব ভালো নকল করতে পারে সৌমি। বলে— 'মার বাজেট ভাষণ। .... এই তো দ্যাখ না, পেট্রলের দাম বেড়ে গেল.... তারপর বাজারে মাছের কেজি.... পেঁয়াজের দাম শুনবি.... তার ওপর দ্যাখ না, এ মাসেই দুটো বিয়েবাড়ি.... হি হি হি, বুঝলি দাদা, কমা, ফুলস্টপ নেই। চলছেই!'

অথচ, আজকে সৌমি....

তাহলে কি, ওই যে ছেলেটা প্রতীক না কি যেন নাম, তাকে নিয়ে নতুন কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?

কিন্তু, সেও তো তিন-চার বছরের পুরনো ঘটনা। তারপর সৌমি ব্যাঙ্গালোরে চলে এল, মনে তো হয়, সেই ঘটনার ওখানেই ইতি।

কথাটা অবশ্য ওভাবে বলা উচিত হয়নি মার। মা এরকম কথা বলতে পারে ভাবতেই পারে না বাপ্পা। '... এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেব।'... বাপ্পা তখন ব্যাঙ্গালোরে এই ডেকান ইউনিভার্সিটিতেই ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। মাকে লুকিয়ে দাদাকে ফোনে সব জানিয়েছিল সৌমি। বলেছিল—

'জানিস, বাপি পর্যন্ত বলছে, এভাবে বলা তোমার ঠিক হয়নি, তবুও মার কি জেদ! বলছে... তবু তো বলিনি, চাবকে সিধে করে দেব!'

... চাবকে সিধে করে দেব!

এরকম কেউ বলতে পারে কাউকে!

সেই সময় সৌমি মার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল, যেটা বাপ্পা মেনে নিতে পারেনি। ও বলেছিল— 'আমার কি মনে হয়, জানিস? মার নিজের কোনও একটা ফ্রাস্টেটেড অ্যাফেয়ার আছে, নয়তো কেউ এত রুথলেস হতে পারে না।'

বাপ্পা বলেছিল— 'ধুস্! ওসব অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার মা'র দ্বারা হবার না।'

সৌমি মানতে চায়নি। বলেছিল— 'ঠাম্মি মাকে কিসব বলত, তোর মনে নেই? ওদের বিয়ের দিন সুন্দরগড়ে কি একটা গোলমাল হয়েছিল।'

একটু একটু মনে পড়ে বটে। তবে ওরা বড় হয়ে ওঠার পর আর অবশ্য ঠাম্মি এ ব্যাপারে কিছু বলত না।

সৌমি হাল ছাড়েনি। বলেছিল— 'দাঁড়ানা, আমি দাদু—দিদাকে একদিন ঠিক জিজ্ঞাসা করব। ভেবেছে কি মা? যা খুশি তাই বলবে?'

শেষপর্যন্ত সৌমি জিজ্ঞাসা করতে পেরেছে কিনা জানে না বাপ্পা। এখন অবশ্য আর জানার কোনও উপায় নেই। দু'জনই প্রয়াত। মা একটাই মেয়ে। আর কোনও ভাই-বোন নেই। তুতো ভাইবোনেরা কেউ সুন্দরগড়ে থাকত না। তাছাড়া মার বিয়ের সময়, এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে, ওদের অনেকেই বেশ ছোট। একটা গোলমাল হয়েছিল অস্পষ্টভাবে কারও কারও মনে পড়লেও, কেন, কি বৃত্তান্ত, সেসব বলতে পারবে না ওরা। মোটের ওপর, কোনও সাক্ষী নেই।

— 'তুই তাহলে কবে আসছিস?' সোজাসুজি প্রশ্ন করল বাপ্পা।

সৌমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল— 'আমি আসছি না।'

— 'সে আবার কি? কেন?'

— 'তুই মাকে জানিয়েছিলি? ফট্ করে যে অতগুলো টাকা খরচ করে টিকিট কেটে ফেললি?'

— 'ঘড়ি-ঘড়ি কি জানাব? বলেছিলাম তো, পাঁচ-সাতদিন আগে।'

— 'তাহলে মর্। উঠবি কোথায়? বাড়ি তো বন্ধ।'

— 'বন্ধ! মানে!'

— 'মানে, মা নেই।'

বুকটা ধক্ করে উঠল বাপ্পার। বলল— 'মানে?'

সৌমি ঝাঁজিয়ে উঠল— 'কি তখন থেকে মানে মানে করছিস? কথা বুঝিস না নাকি? নেই মানে নেই! মা চলে গেছে।'

— 'চলে গেছে!' — অস্ফুটে স্বগতোক্তি করল বাপ্পা। তারপর বলল— 'আর বাপি?'

— 'কোম্পানির গেস্ট হাউসে, আলিপুরে।'

— 'কোথায় গেছে মা?'

— 'জানি না। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবি না আমাকে... ধর তো একটু ফোনটা... আমি রুমের বাইরে বারান্দায় যাই...'

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা।

তারপরই বারান্দায় গিয়ে ফেটে পড়ল সৌমি। বলল— 'ট্রেচারাস... ট্রেচারাস উওম্যান... আগাগোড়া আমাদের সবাইকে ঠকিয়ে এসেছে... আমাকে, তোকে, বাপিকে... সবাইকে।'

— 'কি যা তা বলছিস?'

— 'ঠিকই বলছি। কতটুকু জানিস তুই? হাজার হাজার মাইল দূরে বসে আছিস... দিনরাত মোবাইলে মেসেজ চালাচালি, বারান্দায়, ছাদে গিয়ে ফোন গুজগুজ, খিলখিল হাসি, ফোঁচ ফোঁচ চোখের জল....ভেবেছেটা কি? খুব চালাক না! আমি কিছু টের পাই না?'

— 'সে তো বাপিকেও ফোন করতে পারে....'

— 'থাম, থাম, বকাস না। বাপিকে ফোন করতে ছাদে চড়তে হয় না। ফিসফিস করে কথা বলতে হয় না, সেটে ঠোঁট ছুঁইয়ে কিস্ করতে হয় না... ওঁত পেতে পেতে আমি সব দেখে নিয়েছি.... ক্যারেক্টারলেস... টোটালি ক্যারেক্টারলেস একটা মহিলা... পাগল.. পাভার্টি...'

— 'সৌমি!'

— 'সাট আপ্। আমাকে ধমকাচ্ছিস? পারলে মাকে গিয়ে ধমক দে। জিজ্ঞেস কর... তুমি ঠিক কি? এই কিস্ করছ, এই আবার গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিচ্ছ, শাঁখ বাজিয়ে, ঘন্টা নেড়ে পুজো করছ... আবার আমাকে বলছ ... মামণি, বাপিকে একটা ফোন কর না সোনা, আজ সকালে বেরোনোর সময় বলছিল একটু প্যালপিটেশান হচ্ছে... তুমি কি? তুমি কি?'

চিৎকার করতে থাকে সৌমি।

ওর চিৎকারে কান ভোঁ ভোঁ করছিল বাপ্পার।

কোনওক্রমে বলল— 'কিন্তু, গেছে কোথায়?'

— 'জাহান্নামে! চুলোয়! শুধু একটা মেসেজ... আর কিচ্ছু না। ...একটু বেরোচ্ছি... কটাদিন খোঁজ করো না তোমরা...। ব্যাস। হয়ে গেল। একই মেসেজ বাপিকেও। শুধু বাড়তি... ওষুধগুলো খেও কিন্তু। .... মরে যাই! দুম্ করে যে মানুষটাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলে, আবার তার শরীর নিয়ে চিন্তা! ঠাম্মি কি সাধে বল... তোর মার অনেক ঢং রে, অনেক

STAR

BATTERY LIMITED

MANUFACTURER OF VARIOUS TYPE OF SMF VRLA
&
CONVENTIONAL BATTERIES
On approved list of RDSO, Defence, BSNL
&
various other Govt. Organisation of Repute

1/4C, Khagendra Chatterjee Road,
Cossipore, Kolkata-700 002
Office Tel Nos : 2557-1317/1168/0378
Factory Tel. Nos : 2659-0671/0672
Fax Nos. : 91-33-2257 5184
E-mail : sblcal@cal.vsnl.net.in

With Best
Compliments From :~

Imeco Limited

Maheshtala, Dakghar
Budge Budge Trank Road
24 Parganas (S), W.B.
: 66146615, 6614, 6616,17
Fax 6614-6777, 6614-6789
e-mail : info@imecolimited.com
Webpage : www.imecolimited.com

KHIMJEE HUNSRAJ

(Estd. - 1904)

Govt of India approved golden Export House

with S A 8000 : 2001 Certificate

Manufacturers, Indentors & Exporters :
Leather Wallets, Ladies Bag, Folders, Sheet Glass, Figured Glass, Float Glass / Mirrors, Bentonite and other Items.

Head Office : 9, Rabindra Sarani, Kolkata - 700 073
Tel : (033) 2235-4486 / 87 / 88 / 95, 3292-4221
Fax : 2221-5638, 2215-4941, E-mail : Office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

Branch Office ; Gangaiya Naidu Industrial Avenue
3/5, Valluvar Salai, Ramapuram, Chennai - 600 089

Liaison Office : 310, Hari Chambers
58/64, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai - 400 023

Liaison Office : New Gate, Kachchh-Mandvi, Gujarat - 370 465

ঢং।'

— 'আমি ফোনে ট্রাই করব?'

— 'পাবি না। নির্ঘাৎ সিম খুলে রেখেছে।'

— 'তাহলে পুলিশে খবর দে।'

— 'বাপিকে বলেছিলাম, গা করল না। বলল, পুলিশ মানেই স্ক্যান্ডাল। দ্যাখ না, কটা দিন। ... কি বলব? তোমার বউ তোমাকে না জানিয়ে পালিয়েছে। এটাই তো যথেষ্ট স্ক্যান্ডাল। আর পুলিশে ছুঁলে বাড়তি কি হবে?'

— 'তাহলে আর কি? দ্যাখ, কবে ফিরে আসে।'

— 'আসবে না.... আর ফিরে আসবে না।' সৌমি আবার চিৎকার করতে থাকে।— 'কেন আসবে? আমরা কে? কেউ না। এতদিন পর বাড়ি যাব বলে মুখিয়ে আছি, আর ঠিক সেই সময়টাতেই চলে গেল! ... আসতে হবে না! আসতে হবে না!'

— 'কাঁদছিস কেন?'

— 'না, কাঁদব না। হাসব।'

— 'শোন, শোন, বাড়ির চাবিগুলো কোথায়?'

— 'বাপি খোঁজ করে জেনেছে, ডালিয়া মাসিদের বাড়িতে।'

— 'তাহলে আমরা সেখান থেকে চাবি নিয়ে বাড়িতে ঢুকে যাব। তারপর, আসুন মা।'

— 'আসবে না... আর কোনওদিনও আসবে না। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে মা। কি করে মুখ দেখাব আমরা? তোরা গেলে যা, মা না ফিরলে আমি আর যাব না...'

আবারও কাঁদতে থাকে সৌমি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল বাপ্পা। ধাক্কাটা সেও কিছু কম পায়নি।

তলায় তলায় এতসব ঘটে গিয়েছে গত দেড় দু-বছরে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে অ্যাফেয়ার! তাও কিনা পিওর হাউসওয়াইফ! চাকরি-বাকরি করলে না হয় একটা সম্ভাবনা ছিল।

অ্যাফেয়ার! .. মা করবে অ্যাফেয়ার!.... নতুন, না পুরনো?

বাপ্পা অনুভব করল, বিরক্তি বা ঘৃণার চেয়ে তার যা হচ্ছে, সেটা বিস্ময়।

মেলাতেই পারছে না সে কিছু। এত টান যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল! নাকি, সৌমি ভুল বুঝেছে। হয়তো অন্য কোথাও গেছে, অন্য কোনও কারণে...

নিজের মনেই মাথা নাড়তে লাগল বাপ্পা। হচ্ছে না, জুতসই হচ্ছে না ধারণাটা। বাপের বাড়ি বলে মার আর কিছু নেই। তুতো ভাইবোনেদের বাড়ি যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা আর চেপে যাওয়ার কি আছে?

বাপিকে একবার ফোন করে দেখবে?

নাঃ, থাক। যতই হোক, বাপি নিজে তো তাকে কিছু জানায়নি। হয়তো, আশায় আছে, ফিরে আসবে, এখনই অত উতলা হবার কিছু নেই।

কিন্তু, সত্যিই যদি ফিরে না আসে? সৌমির কথাই যদি ফলে যায়?

ভাবতেই সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল বাপ্পার। যে মার দৌড় উত্তরপাড়ার মার্কেট এরিয়া থেকে বালি ব্রিজ পেরিয়ে বড়জোর দক্ষিণেশ্বর মন্দির পর্যন্ত, এত বছরেও কলকাতার রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই চেনে না, সে সামান্য দূরে যেতে হলেও বাপি কিংবা গাড়িই যার ভরসা, সে এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে পারল? আর সেটা যদি নিতে পারে, তবে তো তার সাহস বেড়েই গিয়েছে, আর ফিরে নাও আসতে পারে সে।

মাথার চুল ধরে টানতে লাগল বাপ্পা।

টুকরো টুকরো কত ছবি মনে আসছে। ... মার হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে বাপ্পা। পিঠে ব্যাগ, মার হাতে জলের বোতলটা ধরিয়ে দিয়েছে। ... তারপর একটু বড়... সাইকেল শিখেছে.. মা দাঁড়িয়ে আছে জিটি রোডের মোড়ে... যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় দেখছে ওকে... ফিরতে দেরি হলে ঘর-বার করছে... জিটি রোডে যা ট্রাফিক... আবার বকাঝকাও করছে খুব... ব্যাঙ্গালোরে হস্টেলে যাবার সময় গুছিয়ে দিচ্ছে সুটকেস... স্বাভাবিক... সবই তো স্বাভাবিক!

এমনকি শেষ যেদিন কথা হল, সেদিনও তো কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। আশ্চর্য! কাউকে একটা ফোন করেনি মা! তাকে নয়, সৌমিকে নয়, বাপিকেও নয়! শুধু মেসেজ করেছে, বাপ্পাকে অবশ্য তাও করেনি। মেসেজ রিসিভ করতে অবশ্য বড্ড টাকা কাটে বলে বাপ্পা নিজেই নিষেধ করেছিল। কিন্তু ... তাহলেও একবার ওকে জানাল না!

তার মানে, কথা বাড়াতে চাইছে না। তাহলেই নানা প্রশ্ন উঠবে। সত্যিই তো, যার কাছে গেল, তার ঘর-সংসার নেই? কোথায় গিয়ে উঠবে মা? নাকি দু'জনেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল!

তাহলে তো চমৎকার!

অসহায় দৃষ্টিতে সদ্য কাটা প্লেনের টিকিট দুটোর দিকে তাকিয়ে বসে রইল বাপ্পা। ক্যানসেলও তো করা যাবে না। নন রিফাণ্ডেবল। পুরো টাকাটা গচ্চা। ... ছিঃ ছিঃ, কোনও মানে হয়! এত ইরেসপন্সিবল্ হতে পারল মা!... পিওর! স্পটলেস! ঋদ্ধি বলেছিল না? এখন শুনলে কি বলবে? সৌমি যা বলেছে তাই? ক্যারেক্টারলেস... টোটালি ক্যারেক্টারলেস...'

মরিয়া হয়ে মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগল বাপ্পা। পিঁক পিঁক করে শব্দ হয়ে যাচ্ছে একটা। লাইনে যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপা দেওয়া আছে।

—'শিট্!'— ফোনটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল

ফ : ২২

বাপ্পা। পরমুহূর্তেই আবার কি মনে করে হাতে তুলে নিল। আবারও টিপতে লাগল বোতাম।

... রিচিং অন নাইনথ্ জুন, মর্নিং টেন ও ফাইভ...

ব্যস! এইটুকুই! আর কিচ্ছু জানাবে না বাপ্পা। তাতে যদি আসার ইচ্ছে হয় তো এস... নয়তো... ঠিকই বলেছে সৌমি... গো টু হেল!

মেসেজটা ডেলিভার্ড হল না। আটকে রইল। কি করবে এখন? ডিলিট করে দেবে?

— 'শিট্।' — আবারও ফোনটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল বাপ্পা।

কাবার্ড খুলে হুইস্কির বোতল বের করল। ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা ঢালল গলায়। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে একটা মৃদু ঠাণ্ডা ভাব। আস্তে আস্তে ওর চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখল বাপ্পা। মা এসে ওর মোবাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন ঘন্টা তিনেক পার হয়ে গিয়েছে। হিসেব করে দেখল বাপ্পা, ইন্ডিয়াতে এখন মাঝরাত। মেসেজটা নিশ্চয়ই আটকেই রয়েছে। হাতে মোবাইলটা তুলে নিতেই চমকে উঠল বাপ্পা। নেই... মেসেজটা নেই... তার মানে... এরই মধ্যে কখনও চালু হয়েছিল মার ফোনটা!

তাহলে কি এখন একবার?

নাঃ। হল না। এবারে পরিষ্কার শোনা গেল, যান্ত্রিক কণ্ঠ। — সুইচড্ অফ!

মিরাক্‌ল!

এ পর্যন্ত কতবার, কতজনের মুখে যে শুনতে হল শব্দটা। বোধহয় সেঞ্চুরি পার হয়ে গিয়েছে।

সাধের বাইকটা অবশ্য শেষ। ইন্সিওর করা আছে, ক্ষতিপূরণ মিলবে বটে, কিন্তু অনেকদিনের সঙ্গী ছিল বাইকটা।

চুপচাপ নানারকম রোমহর্ষক দুর্ঘটনার বিবরণ শুনে যেতে হচ্ছে। কোনওটায় কেউ মৃত, কোনওটায় আহত, কোনওটায় সারা জীবনের মতো অঙ্গহানি। এছাড়াও আছে নানারকমের মিশ্রণ, একই দুর্ঘটনায় কখনও সকলেই মৃত, কখনও কেউ মৃত, কেউ আহত আবার কখনও কেউ মৃত বা আহত হলেও কোনও একজন অক্ষত!

কতরকম!

তার সঙ্গে যুক্ত হল এই দুর্ঘটনাটি। নতুন রকম।

দু'জনেরই মাথায় হেলমেট ছিল। সেটা বাঁচিয়েছে। কিন্তু ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে দু'জনেই চলে যেতে পারত চাকার তলায়। নিদেনপক্ষে একজন। কিন্তু যায়নি। হাত-পা ভাঙতেই পারত, ভাঙেনি। আশ্চর্যের বিষয়, দুর্ঘটনাস্থলের ঠিক পাশেই বোধহয় রাস্তা সারানোর জন্য বালি স্তূপ করে রাখা ছিল। ছিঠকে গিয়ে দু'জনেই পড়েছে সেই স্তূপের ওপর। রোদ্দুরে বালি সামান্য উত্তপ্ত, তাই ছ্যাঁকা লেগেছে, কিন্তু কঠিন মাটিতে পড়লে যা হতে পারত, নরম বালিতে পড়ে তার সিকিও ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু ধাক্কার অভিঘাতে জ্ঞান হারিয়েছিল দু'জনেই। বাইকটা দুমড়ে ছিটকে পড়েছিল উল্টোদিকে, রাস্তার পাশে রুক্ষ জমিতে। সামান্য দূরে পাহাড়, আর পাহাড়ের সারির আড়ালে লোকালয়। এখানের জমিতে চাষ হয় না, তাই গ্রামের পুরুষেরা সকালবেলা গামছায় চিঁড়ে মুড়ি বেঁধে বাসে বা ট্রেকারে চড়ে শহরে চলে যায় কাজে, কিংবা কাজের খোঁজে। মহিলারা ঘর-গেরস্থালির কাজ করে, মোটের ওপর পর্দানসীন।

সুতরাং, জ্ঞান হারিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকলেও উদ্ধারের আশা ছিল না। সকালবেলার ব্যস্ত জনপদ, কে কার খবর রাখবে!

তবে সেখানেও মিরাক্‌ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই কোথাও একটা রুগি নামিয়ে দিয়ে সুন্দরগড় হাসপাতালে ফিরে আসছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স। গাড়ি থামিয়ে ওরাই তুলে এনে দু'জনকে ভর্তি করে দেয় সুন্দরগড় হাসপাতালে। জয়ের বুকপকেটে একটা নোটবুক পাওয়া গিয়েছিল। সেখান থেকে ফোন নম্বর পেয়ে হাসপাতাল থেকে পর পর কয়েকটা ফোন করা হয়। তার মধ্যে একটা নম্বর ছিল সোহিনির। সোহিনির কাছ থেকে খবরটা চলে যায়...

'আঙ্কেল, ফুল নাও।'

বিজনেস পার্টনার বিক্রমের এ ক'দিন ছোটাছুটির অন্ত ছিল না। টানা চারদিন হাসপাতালে রেখে দু'জনের সবরকম পরীক্ষা করা হয়েছে। কিছু পাওয়া যায়নি। ডাক্তারদের মতে, ধাক্কার অভিঘাতে পুতুলের মতো ছিঠকে গিয়েই বড় ধরনের আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছে দু'জনে। শুনে বিক্রমের বউ সুনয়না রসিকতা করে বলেছে— 'দাদা তো পাতলা আদমী, ছিটকে পড়তেই পারেন, বাট তুলিকা ভাবী ঘ্যায়সি মুটি... ইয়ে ভি তো মিরাক্‌লই হ্যায়।'

আজ বিক্রমের সঙ্গে সুনয়নাও এসেছে। সঙ্গে ওদের মেয়ে পিঙ্কি।

— 'আঙ্কেল, ফুল নাও।'

পিঙ্কিকে দেখেই মন ভালো হয়ে যায় জয়ের। বলে— 'আন্টির জন্য?'

সুনয়নার হাতেও একগুচ্ছ ফুল। বলল— 'এই যে আমার কাছে।'

ওরা পাশে তুলিকার ঘরে চলে গেল। বিক্রম ওর বিছানার পাশে বসে বলল— 'বিজনেসের খবর ভালো। এই উইকে আমাদের তিনটে অর্ডার পাওয়ার কথা ছিল। তুমি হাসপাতালে, আমিও ব্যস্ত তোমাকে নিয়ে, ভেবেছিলাম, ফস্কে যাবে। দেখছি তা হয়নি।'

জয় হেসে মাথা নেড়ে বলল— 'ভালো।'

— 'ঘুমটুম ঠিক হচ্ছে তো?'

— 'হচ্ছে।'

— 'ডাক্তাররা বলছেন, তোমাদের কিছুদিন পর্যন্ত যেটা ভোগাবে, সেটা হল একটা মেন্টাল ট্রমা।'

— 'জানি। দিয়েছেন তো কিসব নার্ভের ওষুধ-টষুধ।'

বিক্রম একটু চুপ করে থেকে বলল— 'তার সঙ্গে আমি বলি কি, তুমি আর ভাবী দু'জনে দিনকতক একটু বাইরে ঘুরে এসো। ধারেকাছেই যাও না— এই ধরো, পুরী।'

জয়ও সামান্য চুপ করে থেকে বলল— 'তুলিকা কোথাও যাবে না। ও কাল ওর বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছে।'

— 'বাপের বাড়ি!'

— 'হুঁ। ... ওখান থেকে ওর স্কুলটাও কাছেই হয়, রিক্সায় যাতায়াত করবে। এখান থেকে... বাইকটা তো আর নেই।'

— 'তা ঠিক। তবে গাড়ি তো আছে।'

— 'সত্যি বলতে কি, এখন কিছুদিন আমি ড্রাইভ করতে পারব না। দেখি, একটা ড্রাইভার রাখতে হবে। অফিসের ড্রাইভারদের দিয়ে হবে না।'

— 'আমি দেখছি। ভাবী কবে ফিরবেন?'

জয় একটু হাসল। তারপর বলল— 'সেটা বোধহয় উনি নিজেও জানেন না।'

বিক্রম চুপ করে রইল। ... 'গুড নেস্ট'.. বাড়ির একটা গালভরা নাম আছে বটে, কিন্তু আসলে এখানে...

জয় একটু সামলে নেবার চেষ্টা করল। বলল— 'তাছাড়া ওখানে ক'দিন ধরে কি সব হোমযজ্ঞও হবে, ওদের বংশের গুরুদেব আসবেন, সে সব সেরেটেরে তারপর বোধহয়....

— 'তুমিও যাও না? তোমাদের জন্যই তো যজ্ঞ-টজ্ঞ।'

— 'দূর! ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, তুমি ভুল করছ। যা করা হচ্ছে, সেটা ওঁর ভালোর জন্য, আমার জন্য নয়।'

— 'এটা হয়তো তোমার ভুল ধারণা।'

— 'না। আমি শুনেছি, ফোনে উনি কি বলেছেন। যা হবে সব ওঁরই জন্য। ... আরও শুনবে? ওঁর বাপের বাড়ি থেকেও দুর্ঘটনার জন্য আমাকেই দায়ী করা হয়েছে।'

— 'আসলে তুমি চালাচ্ছিলে তো, তাই...'

— 'আর উনি যে প্রতিদিন বেরোতে লেট করতেন, তারপর আমাকে বাইকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটাতে হত, সেটা বুঝি কিছু না?'

বিক্রম আবারও একটু চুপ করে থেকে বলল— 'ছেড়ে দাও। ... আমি তৎকালে টিকিট করে দিচ্ছি, সী-হক হোটেলে একটা ভালো রুম বুক করেও দিচ্ছি, তুমি পুরী চলে যাও। স্রেফ বেড়িয়ে এসো কয়েকটা দিন।'

— 'ভাবছি। ... মা-ও বলছিলেন, এত বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচলি। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়।'

— 'তুমি পুজো দেবে?'

জয় ফিকে হাসি হাসল, বলল— 'মার কথা তো! ফেলতে পারছি না।... ভালো কথা, তুমি সেই অ্যাম্বুলেন্সের লোকদুটোকে ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড দিয়েছ তো? ওরাই তো আসল জগন্নাথ।'

— 'দিয়েছি।'

— 'ওরাই ঈশ্বর। হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ওদের হয়তো আমরা ছোটই করলাম!'

— 'আমি বলেছি, সামনে রথ। বউ-বাচ্চাদের ভালো জামাকাপড় কিনে দেবেন, আনন্দ করবেন সবাই মিলে।'

— 'তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি তো শুধু বিজনেস পার্টনার নও, বন্ধু। আর বয়েসে আমার চেয়ে ছোট হলেও বিচক্ষণ।'

— 'বলো।'

জয় জানালা দিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। মুখের ভাব শুধু বিষণ্ণ নয়, একটু যেন বিপন্ন। সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সে। তারপর বলল— 'ভাবছি, ক'দিন ধরেই কথাটা ভাবছি। .. আমি যা করছি, সেটা কি পাপ?'

বিক্রম ইঙ্গিতটা ধরতে পারল। ব্যাপারটা সে জানে। জয়ই বলেছে। তার প্রেমহীন জীবনের একমাত্র প্রেম। কি যেন নাম মহিলার? একটা নদীর নাম... কৃষ্ণা... না, না, যমুনা... নাঃ ইয়েস... কাভেরী! ... লিভস্ সামহোয়্যার নিয়ার ক্যালকাটা।

— 'তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন?' — বিক্রম জিজ্ঞাসা করল।

— 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর মনে হচ্ছে, এটা কি একটা ওয়ার্নিং?'

— 'ইটস্ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট।'— বিক্রম বলল।

— 'জানি। কিন্তু এতবছর তো বাইক চালাচ্ছি। হঠাৎ কি হল?'

— 'এসব তো হঠাৎ-ই হয়।'

— 'তা ঠিক। তবে আমি জানি, আমার সতর্কতার অভাব হয়েছিল। আজকাল আমি প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকি।'

বিক্রম চুপ করে রইল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও সে জানে, এই ধরনের সম্পর্কে যারা জড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন থাকে।

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

JINDAL
AN ISO 9002 COMPANY
JINDAL ALUMINIUM LIMITED

NALCO
Aluminium Sheet Coil

DALOM
Aluminium Extruded Section

OZONE
FOR A SAFER WORLD
Patch Fittings

ALSTRONG
ALUMINIUM COMPOSITE PANELS

AluDecoR

A stone

DECOGRILLE
AN ISO 9002 COMPANY
DESIGNER ALUMINIUM GRILLS

WACKER
SILICONE SEALANT

HÄFELE

essel

Pidilite

Alupan

insta

CEL

FUJI BOND
Aluminium Composite Panel

HARDWYN
Floor Spring

HARDWARE FITTINGS

EAGLE STAR
STARLOCK

Garnish
DOOR CLOSER DEVICES

BEARINGS

PILE WEATHER STRIP

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA
Office : 3040 8706 / 07, **Aluminium Div. :** 3040 8731 / 32 / 33 / 34, 2215 5333
Hardware Div. : 3040 8727/28/29, 2215 9290. **Fax :** +91-33-2215 0455, 3040 8730
E-mail : **info@alloyindia.com** **Website :** www.alloyindia.com

কয়েকদিনের না-কামানো দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে জয় বলল— 'তুলিকার সঙ্গে কাগজ কলমের বাইরে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আর কিছু হবারও নয়। এভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের দিন হয়তো চলবে। কিন্তু ধরো, ওই অ্যাক্সিডেন্টে তুলিকার যদি মৃত্যু হত, কিংবা বড় ধরনের কোনও শারীরিক ক্ষতি, তা হলে কি আমি নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারতাম?'

বিক্রম একটু চুপ করে থেকে বলল— 'তুমি এসব ভুলে যাও।'

জয় একটু হাসল। বলল— 'ভুলে যাওয়াটা বড় কথা নয়। নিজের মুখোমুখি হওয়াটা দরকার। আসলে কি জানো! কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য, সে হিসাব আমার গুলিয়ে গিয়েছে। ... পরস্ত্রীকে কামনা করা পাপ, অথচ সেই কামনা আমার মধ্যে পুরোমাত্রাই রয়েছে। আবার ভাবছি, প্রেম কি পাপ হতে পারে? সে তো পুণ্য!... তুমি কি বলো?'

— 'জটিল প্রশ্ন। এককথায় উত্তর দেওয়া মুশকিল।'

— 'তবে আমিই বলি, শোনো। আমার মনে একটা বিশ্বাসও কাজ করছে। ... এই যে বেঁচে গিয়েছি, সেটা ভালবাসারই পুণ্যে!'

— 'তাহলে কোনও একটা বিশ্বাসেই স্থির থাকো।'

জয় একটু হেসে মাথা নাড়তে লাগল। বলল— 'না হে, বন্ধু। তা হয় না। পাপ আছে, অবশ্যই আছে। পাপকে বাদ দিয়ে পুণ্যকে ছোঁয়া যায় না। ফুল তুলতে গেলে হাতে কাঁটা বিঁধবেই।'

— 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

— 'করো।'

— 'ওই যে মহিলা.... কাভেরী... ঘটনাটা জানেন?'

— জানে। আমার জন্য পুজো দিয়েছে ওদের বাড়ির কাছে দক্ষিণেশ্বর টেম্পলে। ...এমনকি, শুনলে হয়তো হাসবে, তুলিকার জন্যও।'

— 'আশ্চর্য।'

— 'আরও আশ্চর্য কি শুনবে?'

— 'বলো।'

— 'কাবেরীর নিজের মনে কোনও পাপবোধ নেই।'

— 'নেই!'

— 'না। দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, নানারকম টানাপোড়েন আর তার জেরে মানসিক চাপ বা ক্লান্তি— এসবই আছে, কিন্তু পাপবোধ নেই।'

বিক্রম কি একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পিঙ্কিকে নিয়ে সুনয়না এঘরে ঢুকে বলল— 'চলো, এবার যাই।'

ওরা চলে যাবার পর জয় উঠে পাশের ঘরে গেল। বড় বাতিটা নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুয়ে আছে তুলিকা। চোখ বন্ধ, গায়ে একটা পাতলা চাদর।

জয় সামান্য চুপ করে থেকে বলল— 'বিক্রম বলছিল, দিনকতক একটু হাওয়া বদল করে আসতে। কাছেই, বেশি দূরে কোথাও নয়, এই যেমন পুরী। ও ট্রেনের টিকিট কেটে দেবে, হোটেলের ব্যবস্থাও করবে।... তুমি যেতে চাও?'

কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু হাত নাড়ল তুলিকা। সে যাবে না। চোখ যেমনকার তেমনই বন্ধ।

জয়ও আর কিছু বলল না। পাশেই দোতলার বারান্দা। সেখানে পায়চারি করতে লাগল। ... পুরী!... মন্দ নয়। কিছুদিন আগেই গিয়েছিল। তবে কাজে। এবারে একটু অন্যরকমই হোক না।

কি ভেবে মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগল জয়।

আজ খুব হাওয়া দিচ্ছে। সমুদ্রও উত্তাল।

সেই উত্তাল সমুদ্রকে পশ্চাৎপটে রেখে বসেছিল ওরা দুজনে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে। একজনের স্পর্শ যেন খুঁজছে নির্ভরতা, আর একজনের স্পর্শ দিচ্ছে আশ্বাস।

সন্ধে হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। সারি দিয়ে জ্বলে উঠেছে অগুনতি হোটেলের বাতি। পথ জনাকীর্ণ। সমুদ্রের পাড়ে আর এক সমুদ্র।

আজ দু'দিন হল ওরা পুরীতে এসেছে।

সোহিনি বলল— 'রিংকা, এবার অন্তত বাড়িতে একটা খবর দে।'

কাবেরী মাথা নাড়ল, না।

— 'এটা কিন্তু তোর পাগলামি।

কাবেরী মৃদু হাসল। সামান্য দেখা গেল ওর ঝকমকে পরিপাটি দাঁতের সারি। উড়ে যাওয়া অবাধ্য শাড়ির আঁচল সামলে নিয়ে বলল— 'শুধু এটা বলছিস কেন? সবটাই তো পাগলামি। এই দু'দিনে যা যা করলাম, আরও যা যা করব।'

সোহিনি বন্ধুর দিকে ঘুরে বসল। তেমন কিছু সাজেনি রিংকি। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুলে আলগা একটা রিবন লাগানো। কপালে একটা ছোট টিপ, ঠোঁটে খুব হালকা লিপস্টিক। নীল-সাদা রঙের শাড়িটা সুতির। বাঁ-হাতের মণিবন্ধে ছোট্ট সোনালি ঘড়ি। পায়ে বেল্ট বাঁধা লেডিস সু।

খুব নরম। মোলায়েম ওর হাতের মুঠি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই সোহিনির হাত ধরে বলেছিল— 'দেখিস বাবা, হাত ছাড়িসনা আমার। কিচ্ছু চিনি না। কোথায় হারিয়ে যাব।' এখনও যেন শিশুর মতোই আঁকড়ে ধরে আছে সোহিনির

LAUREL SECURITIES PRIVATE LIMITED

(MEMBER : THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(INVESTMENT & MUTUAL FUNDS ADVISOR)

JAIN BAID & COMPANY

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

312/313, Todi Chambers,
2, Lal Bazar Street, Kolkata-700 001
Phone Nos. 2230 0405, 2230 5846, Fax : (033) 2248 1576
E-mail : prakash_laurel@yahoo.com

A

WELL WISHER

হাতের মুঠি।

পিওর হাউসওয়াইফ। অথচ...

— 'তোর এত সাহস কি করে হয়?' বন্ধুর নরম আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল সোহিনি।

— 'দেখলাম, পারি কিনা।' — হাসল কাবেরী— 'সব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে।'

— 'একাই আসতে পারতি।'

— 'ও কথা বলিস না। এই সাতচল্লিশে এসে, মনে হচ্ছে, সবে হাঁটতে শিখেছি। এখন ক'টা দিন তুই আমার হাত ধরে রাখ।'

সোহিনি একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল— 'আমি বোধহয় তোর ভালোর চেয়ে মন্দই করলাম রে রিংকা। তোর ঘর ছাড়িয়ে তোকে বাইরে টেনে আনলাম।'

— 'চুপ কর। ওকথা বলিস না। বড্ড বেশি ঘরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মেয়েও হাসত আমাকে। বলত— সারাদিনে করটা কি? রূপচর্চা?'

— 'তুই পারবি আমাদের সঙ্গে এত কাজ করতে? বৃদ্ধাশ্রম, পথশিশু, প্রতিবন্ধী... আমাদের এন জি ও-র অনেকগুলো শাখা।'

— 'পারব। কেন পারব না? তুই নিয়ে দ্যাখ আমাকে।'

সোহিনি চিন্তিতমুখে বলল— 'সে না হয় হলো। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। এই এতটা বয়েসে এসে যে ঝুঁকি তুই নিলি, তার কি হবে?'

ঝুঁকে পড়ে জুতোর বেল্ট সামান্য আলগা করে নিল কাবেরী। তারপর বলল— 'কিছু হবে না। ঠিক বাঁচব।'

— 'পুরোটা ভেবে দেখেছিস? তোর বর... তোর অত বড় বড় দুটো ছেলেমেয়ে!'

কাবেরী মাথা নেড়ে বলল— 'সব ভেবেছি। এতদিন সব লুকিয়ে রাখতাম। যেন নিজের এক গোপন কুঠুরি। সেখানেই হাসতাম, কাঁদতাম, প্রলাপ বকতাম। কিন্তু দেখছি তাতে মনের ওপর চাপ বাড়ে। যেদিন তুই জয়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা দিলি, অঝোরে কেঁদেছি। আবার চোখ মুছে স্বাভাবিক কাজকর্ম করেছি। এখন ভাবছি, এও তো অভিনয়, প্রবঞ্চনা। তার চেয়ে খুলে দিই আমার গোপন কুঠুরির দরজা।'

সোহিনি মাথা নাড়তে লাগল, বলল— 'আমি ভাবতে পারছি না।'

— 'কেউ ভাবতে পারবে না। তবু ভাবাতে হবে। আমি ভাবাব।'

বন্ধুর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল সোহিনি। পশ্চাৎপটে অতলান্ত সমুদ্র। এই সমুদ্রই কি মানুষকে এত সাহসী করে দেয়? এখানে বসে যা বলছে রিংকি, পারবে কি সেটা শহরে তার নিজস্ব গৃহকোণে বসে বলতে?

— 'মা' জী!'

চমকে উঠল সোহিনি। কে তাকে এখানে মা বলে ডাকল? সে বিয়ে করেনি। তবুও যে অনেকেরই মা, আবার নির্দিষ্ট ভাবে কারও নয়।

ফিরে তাকাল সোহিনি। তাদের আশ্রমের পথশিশুদের মতোই একটি শিশু। হাতে জুতো পালিশের সরঞ্জাম।

সোহিনি বলল— 'লাগবে না, যা। ... স্যান্ডেল।'

ছেলেটা হাঁটু মুড়ে বসে কাবেরীর বেল্ট-বাঁধা জুতোয় হাত রেখে বলল— 'আপ দিজিয়ে না মাঈজী।'

একটু হেসে কাবেরী বলল— 'ঠিক আছে, খোল্।'

ছেলেটা খুশি হয়ে জুতোর ক্লিপ খুলতে লাগল। কাবেরী ওর গাল টিপে দিয়ে বলল— 'ভালো করে পালিশ করবি কিন্তু।'

— 'দেখিয়ে না মাঈজী। একদম চকাচক্। আপকি গোরী প্যায়ের মেঁ ইয়ে রেড সু কিতনা আচ্ছা লগেগা!'

খিলখিল করে হেসে উঠল কাবেরী। তারপর সোহিনির হাত ধরে টেনে বলল— 'চল না, খালি পায়ে বালির ওপর একটু হেঁটে আসি।'

— 'এই অন্ধকারে? দেখিস বাবা, পায়ে কিছু ফুটে-টুটে যাবে না তো? তুই যা পাগলামি করছিস।'

— 'কিছু হবে না। আয় না।... এই ছেলে... এই দ্যাখ, আমরা ওই চায়ের স্টলটা পর্যন্ত যাচ্ছি। আমাদের ডেকে আনবি।'

— 'যাইয়ে না, মাঈজী! কোই বাত নেহি।'— সহোৎসাহে কাজ শুরু করে দিয়েছে ছেলেটা।

রাস্তা থেকে বালিয়াড়িতে এসে নামল ওরা। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে ঝক্‌মক করছে তারা। আজকাল বালিয়াড়িতে দোকানের কমতি নেই। জায়গায় জায়গায় আলো, আবার খাপছাড়া অন্ধকার। তার মধ্যেই হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে অগুন্‌তি মানুষ। ফানুসের মতো আলো ছুঁড়ছে সমুদ্রের বুকে। সাঁ সাঁ করে বইছে হাওয়া, সঙ্গে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে খেলা করে চলেছে সমুদ্র।

নরম বালিতে একটু যেন ভিজে ভাব। মুক্ত পায়ের পাতা অনেকখানি ডুবিয়ে দিল কাবেরী। বলল— 'আঃ, কি আরাম!' তারপর সোহিনিকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল— 'স্যান্ডেলটা খুলে হাতে রাখ্ না?'

সোহিনি বলল— 'তোর সাহসে এত ধুনো কে যোগাচ্ছে? সমুদ্র?'

কাবেরী কিঞ্চিৎ উদাসীন মুখে উত্তর দিল— 'ঠিক জানি না। হয়তো তাই।'

— 'আমার কাছ থেকে জয়ের পুরীতে আসার খবর পেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে এলি। এখনও বাড়ির সঙ্গে

কোনও যোগাযোগ করছিস না। তুই কি আমাকে পুলিশে ধরাবি?’

কাবেরী একটু হেসে বলল— ‘না রে, ... মাঝে মাঝে মোবাইল চালু করলেই ওদের মেসেজ পাই।’

— ‘তাহলে কথা বলিস না কেন?’

— ‘এই তো মোটে দু-তিনটে দিন। একটু না হয় নিজের মতই রইলাম।’

— ‘তোর মধ্যে এত পাগলামিও ছিল!’

— ‘শুধু ছিল বলছিস কেন? এবার থেকে আছে, থাকবে। অনেকদিন তো স্বাভাবিকের জীবন কাটালাম। জ্ঞান হওয়া থেকে এই সাতচল্লিশটা বছর!’

দু’জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল ওরা। সোহিনির এক হাতে স্যান্ডেল, অন্য হাতে কাবেরী। বালি ভিজে নরম, সত্যিই আরামদায়ক।

— ‘যা করলি, তাতে তোর মনে কোনও পাপবোধ নেই?’

কৃষ্ণপক্ষের তারাভরা আকাশ মাথার ওপরে নিয়ে কাবেরী অম্লান স্বরে বলল— ‘না।’

— ‘তুই না পরস্ত্রী!’

কাবেরী একটু চুপ করে রইল। তারপর শান্ত অথচ গভীর কণ্ঠে বলল— ‘এখন থেকে আমার একটাই পরিচয়, .. আমি আবারও মা।’

উত্তাল একটা ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল ওদের শাড়ির প্রান্ত। সামান্য টলে গেল দু’জনেই। সামলে নিয়ে সোহিনি বলল— ‘এই সত্য প্রকাশ করতে পারবি?’

— ‘বলেছি তো, আমার গোপন কুঠুরির দরজা আমি নিজেই ভাঙব। ..আমি সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই, সোহিনি, সবাইকে নিয়ে।’

— ‘কিন্তু সবাই যদি সেটা মানতে না চায়?’

— ‘সেইজন্যই তো তোর কাছে কাজ চাইছি। আমাকে কাজ করতে দে, সোহিনি। একটু অন্যভাবে বাঁচি। ... তুই তো কত পথশিশুর মা। আমার সঙ্গে থাকবে, সে তো আর যাই হোক পথশিশু নয়।’

হাত থেকে স্যান্ডাল ফেলে দিয়ে দুই হাতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল সোহিনি। বলল— ‘তোকে কাজ আমি দেব, রিংকি। শুধু মনেপ্রাণে চাই, তোর ঘর যেন না ভাঙে।’

কাবেরী ঠোঁট ছোঁয়াল বন্ধুর গালে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল— ‘যদি তাসের ঘর না হয় তো ভাঙবে না।’

— ‘মাঈজী।’

দু’জনেই চমকে উঠল। .... সেই ছেলেটা!

— ‘আপনাদের ডাকছি, শুনতেই পাচ্ছেন না।’— ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারে ছেলেটা।

তা হতে পারে অবশ্য, হাঁটতে হাঁটতে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে ওরা। তাছাড়া সঙ্গে আছে সমুদ্রের গর্জন, হাওয়ার শব্দ।

— ‘আইয়ে, কাম খতম হো গিয়া।’

বালি ভেঙে ছেলেটার পিছু পিছু রাস্তায় ফিরতে শুরু করল ওরা। কাবেরী বলল— ‘যাই বলিস, খালি পায়ে বালি ভাঙার মজাই আলাদা। কি নরম, আর কি ঠাণ্ডা!’

রাস্তায় উঠে রেলিংয়ের ওপর বসতেই ছেলেটা একটা তোয়ালে বার করে খুব যত্ন করে মুছিয়ে দিল কাবেরীর পা দুটো। তারপর জুতো পরিয়ে বেল্ট আটকে দিল। বলল— ‘ঠিক হ্যায় না মাঈজী? একদম চকাচক্।’

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল কাবেরী। তার পা এমনিতেই সুন্দর। তাছাড়া যে নিয়মিত পেডিকিওর করায়। হেসে বলল— ‘ঠিকই বলেছিলি। একদম চকাচক্। কি নিবি, বল?’

— ‘আপ কি যো মর্জি।’

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করল কাবেরী। বলল— ‘হ্যাঁরে, তুই কোথায় থাকিস? তোর বাড়িতে কে আছে?’

— ‘এখানেই থাকি, মাঈজী। বাড়িতে বাপ, ভাই, দুটো বোন আছে।’

— ‘তোর মা?’

— ‘নেই মাঈজী। তোমরাই আমার মা।’

বুকটা ধক্ করে উঠল কাবেরীর।

আহা রে! এইটুকু ছেলের মা নেই।

— ‘তুই আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চল। আমাদের কাছে থাকবি।’

— ‘নেহি, মাঈজী। আমার বাপ-ভাই-বোনেদের কে দেখবে?’

হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল ছেলেটা। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কাবেরীর দু-পায়ের আঙুলে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। সিরসির করে উঠল কাবেরীর সারা শরীর। অস্ফুটে বলল— ‘এই, কি করছিস?’

— ‘কুছ নেহি, মাঈজী। আপকা প্যেয়ার কিতনী সুন্দর! বিকুল মা কি তরা।’— বলে একটু মুচকি হাসল। তারপর বলল— ‘আউর ইয়ে রেড সু পহেনকে ... একদম চকাচক্।’

ছেলেটা চলে যেতে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল কাবেরী। তারপর একটু চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বন্ধুকে বলল— ‘সোহিনি, চল।’

রাতে হোটেল ফিরে খাবার পরই শুয়ে পড়ল সোহিনি। কাল ভোর পাঁচটায় গাড়ি আসবে। কাবেরীকেও ডেকে বলল— ‘রিংকা, আয়। শুয়ে পড়।’

কাবেরী কিন্তু তক্ষুণি শুতে গেল না। রুমের বাইরে একফালি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। তিনতলার ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকাল। খানিকটা রাত হয়েছে। সন্ধের উপচে পড়া ভিড় আর নেই। তবুও পুরো নির্জন নয়। দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল কাবেরী।

কে বিক্রম, কাবেরী তাকে চেনে না। জয়ের বিজনেস পার্টনার, এইটুকুই শুধু জানে। কিন্তু, মনে মনে তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করে কাবেরী। জয়ের কাছ থেকে খবর পেয়েই ওদের জন্য এই রুমটা বুক করে দিল।

আড়চোখে পাশের ব্যালকনির দিকে তাকাল কাবেরী। লাগোয়া ঘরটা বন্ধই পড়ে আছে। জয় আজ সকালেই ছেড়ে চলে গেছে। বেচারা! আরও দু'দিন ওর থাকার কথা ছিল পুরীতে। কাবেরীর জন্যই হল না। এখান থেকে চলে গেল ভুবনেশ্বর, কি একটা সামান্য কাজের অজুহাত দেখিয়ে। সেখান থেকে পরশু সুন্দরগড়ের ট্রেন ধরবে।

কাল রাতেও চোখে ঘুম আসছিল না কাবেরীর। শরীর-মন দুইই অস্থির হয়ে উঠেছিল। পাশেই শুয়ে সোহিনি ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। শেষপর্যন্ত উঠে পড়েছিল কাবেরী। এ ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক্ করে দিয়ে পাশের ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছিল। জয়ও জেগেই ছিল নিশ্চিত। টোকা দিতেই দরজা খুলে বলেছিল— 'তুই!'

ঘরে ঢুকেই নাইট-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়েছিল কাবেরী। ঘরে ফিরে এসেছিল পঁচিশ বছর আগের সেই আদিম অন্ধকার। কালও ঝড়ের মতো বাতাস বইছিল। সমুদ্র ছিল উত্তাল।

ভোরের আলো ফুটতে জয় অস্ফুটে বলেছিল— 'বারবার আমরা পাপ করছি, রিংকা। পঁচিশ বছর আগে, আবার পরেও।'

কাবেরীর ঠোঁটের হাসি তখন শান্ত, মৃদু। ভোরের নরম আলোর মতোই। বলল— 'কে বলেছে পাপ? ... পুণ্য।'

জয় মানতে পারেনি। বলেছে— 'পাপ নয়? তখন তুই ছিলি অন্যের বাগদত্তা, আর এখন পরস্ত্রী।'

কাবেরী দু-হাতে ধরে জয়ের মুখটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এল। বলল— 'তোকে কি বলেছিলাম, মনে নেই? আমি ছাড়া কেউ তোর সন্তানের মা হতে পারে না।'

জয় চমকে উঠে বলল— 'এ তুই কি করেছিস, রিংকি?'

— 'চুপ কর। ... আমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে। তবে তারা হয়েছে অভ্যাসে, নিয়মে। এবার যে আসবে, সে আসবে ভালবাসায়। কোথায় পাপ? সবটাই পুণ্য!'

জয় অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগল। বলল— 'আমি মানতে পারছি না, পারছি না। আর কিছু না হোক, এতটা বয়েসে তোর এই ধকল... এ তুই কি করলি, রিংকি?'

কাবেরী হাসল। ভোরের মায়াবী আলো তার হাসিতে। বলল— 'শুধু ভোগ তো করিনি। তাহলে হয়তো পাপ হত। দায়টাও নিয়েছি। ... ভাবিসনা কিছু। তুই যেমন বেঁচে গিয়েছিস, আমিও তেমনই বেঁচে থাকব।'

বেচারী জয়! তবুও স্বস্তি পায়নি। ওরা পুরুষ। সম্ভোগে কখনও তৃপ্ত, কখনও লজ্জিত। নারীর লজ্জা নেই। সম্ভোগ অতিক্রম করে সে মাতৃত্বে উত্তীর্ণ।

সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ল। কত যত্ন করে তার দুটো পা মুছিয়ে জুতো পরিয়ে বেল্ট বেঁধে দিয়েছিল! আঙুলের যতটুকু দেখা যায় সেখানে হাত ছুঁইয়ে কি যেন বলেছিল। ... যেন মায়ের পা! কি সুন্দর! .. হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল।

... কোথায় পাপ? নারীত্বের চরম উৎকর্ষে পৌঁছে তার চতুর্দিকে এক আলোর-বৃত্ত। মাতৃত্বের গরিমা!

সেই গরিমাকে সম্বল করে সোহিনিদের আশ্রমে পথ-শিশুদের মধ্যে নেমে যাবে সে। ঘর তার থাকবে, কিন্তু শুধুই ঘরোয়া জীবন আর সে কাটাবে না।

অতলান্ত, অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল কাবেরী। মনে মনে বলল— 'তুমিই বোধহয় আমাকে সাহস জুগিয়েছ...। তোমাকে প্রণাম।'

আজ বাপ্পা আসবে।

সকাল দশটা পাঁচে ওর প্লেন নামবে দমদমে।

কি বলবে ছেলেকে সঞ্জীব?

অথচ, এখনও পর্যন্ত মাত্রই পাঁচটা দিন। মাত্রই এই কয়েকটা দিন রিংকি নেই। এমনকি তার খবরও নেই।

নাকি, খবর আছে?

ছোটমাসি গিয়েছিল পুরীতে। সেখানে নাকি রিংকিকে দেখেছে। রিংকি পুরীতে।

— 'তুমি কথা বললে না কেন?'— সঞ্জীব জানতে চেয়েছিল।

— 'পাগল! ভিড়ের আড়াল থেকে তোর বউয়ের কীর্তিকলাপ দেখলাম। ধিঙ্গি একটা মহিলা আছে সঙ্গে। আবার তারপর কোত্থেকে একটা ছেলেও এসে জুটল।'

— 'ছেলে!'

— 'ছোকরা নয়। সেটাও মাঝবয়সী। সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে তোর বউ তো ওরই হাত ধরে সী-বিচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আবার একসঙ্গে নাইতে নেমেছিল সমুদ্রে।'

— 'তুমি ঠিক দেখেছ?'

— 'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ... আমি বলছি। এই সেই ছেলে। তোর

বউয়ের লাভার। এরই জন্য তোর বিয়ের দিন সন্ধেয় ওড়িয়া-বাঙালি রায়ট লাগতে বসেছিল। ... শেষতক কি হবে জানি না, আমি তো ফিরে চলে এসেছি। ভালো চাস তো পুলিশে খবর দে। ইলোপ করবে তোর বউকে।'

এসব একটা কথাও মেয়েকে বলতে পারেনি সঞ্জীব। সৌমি কাল বাড়ি এসেছে। তার আগে একদিন বন্ধুর বাড়িতে ছিল। পাশের বাড়ির ডালিয়াদের কাছে খোঁজ করে চাবি নিয়ে বাড়ি খুলেছে। রিংকি নাকি ওকে মেসেজ করে জানিয়েছিল। বাড়িতে ঢুকে ও ফোন করেছে সঞ্জীবকে। তখনই তড়িঘড়ি চলে এসেছে সঞ্জীব। মেয়েকে তো আর একা বাড়িতে রাখা যায় না!

ছোটমাসির কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে কি করবে সঞ্জীব? পুলিশে খবর দেবে, নাকি ত্যাগ করবে রিংকিকে?

অসম্ভব। বাধ্য হয়ে প্রথমটা যদিও বা করা যায়, দ্বিতীয়টা সে করতেই পারবে না। এই পাঁচদিনেই সে বুঝে গিয়েছে পঁচিশ বছরে যা বোঝেনি। রিংকি তার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। আলাদাভাবে এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার খেয়াল কেউ করে না, শুধু দমটা বন্ধ হয়ে এলে বোঝে স্বাভাবিক হলেও তা কত মহার্ঘ!

হয়তো সে রিংকির মনের খবর রাখেনি। মাথাই ঘামায়নি তার ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু রিংকি নিজেও তো কিছু বলেনি। শুধু স্বাভাবিকের অভিনয় করে গিয়েছে। এই অভিনয়ের টানাপোড়েনের যন্ত্রণা থেকেই কি সে রাত্রে ও নিঃশব্দে নীরবে চোখের জল ফেলছিল? তাও তো কিছু বলেনি সঞ্জীবকে। যদি ফিরে আসে, তবে কি কিছু বলবে? ছোটমাসি যেমন বলেছে। সত্যিই কি রিংকি পুরীতে ওর প্রেমিকের সঙ্গে মিলতে গিয়েছিল?

ছোটমাসির বর্ণনায় একটা কদর্যতা আছে। কিন্তু সঞ্জীব জানে, কাদা ঘাঁটতে পারে না রিংকি। ওর একটা রুচি আছে, আছে একটা পরিপাটি পরিচ্ছন্নতাবোধ। ছোটমাসি যতই চেষ্টা করুক, এই বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেনি সঞ্জীবকে। তাই সঞ্জীবের মনে হচ্ছে, রিংকি ফিরে আসবে। আজ না হোক কাল। পুলিশে খবর দেবার দরকার নেই।

তবুও আজ সকাল থেকে বুক ধক্‌ধক্ করছে সঞ্জীবের। আজ বাপ্পা আসছে। তাকে কি বলবে? চাপা একটা উত্তেজনা হচ্ছে। অথচ তার শরীরের পক্ষে ভালো নয়। প্রেসার আছে, সুগারও। রিংকি তো জানে সব কথা।

ড্রাইভার নীলকান্ত আটটাতেই চলে এসেছে গ্যারাজ থেকে গাড়ি নিয়ে। বাড়িতে অস্থির লাগছিল। সৌমিকে নিয়ে বেরিয়েই পড়ল সঞ্জীব।

ভাবছে সৌমিও।

দাদাকে আজ কি বলবে?

ঝোঁকের মাথায় সেদিন অনেকগুলো খারাপ খারাপ কথা বলেছে মার সম্পর্কে।

সত্যিই কি মা এতটাই খারাপ?

চোখের সামনে না থাকায় মাকে যেন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে সৌমি। বুঝতে পারছে, যাই করুক, মাকে ছাড়া এই বাড়ি ফাঁকা, অর্থহীন। মা-ই এই সংসারের প্রাণভ্রমরা।

অথচ এই মা-ই ক্রমশ একা হয়ে পড়ছিল। আরও একা হয়েই পড়বে। দাদার কোনও ঠিক নেই, মাসখানেক পর আবার পাততাড়ি গোটাবে, সৌমিও চাকরিতে ঢুকবে, তারপর কিছু পয়সাকড়ি জমিয়ে সেও দাদার মতো বিদেশের টিকিট কাটবে। বাপির ব্যস্ততা বাড়বে বই কমবে না। মার জন্য তাহলে কে থাকবে, কি থাকবে?

কোনও ফাঁকই শূন্য থাকে না। ভরাট হয়ে যায়। মার জীবনেও নিশ্চয়ই ফাঁক ছিল, ক্রমশ বাড়ছিল। সেই ফাঁকই মা ভরাট করত ফোন করে, মেসেজ করে।

পুরনো প্রেম?... হয়তো তাই।

যদি ফিরে আসে, মা কি সেকথা ভাঙবে?

ভাবতে ভাবতে সৌমির হঠাৎ একটু হাসি পেল। কয়েকমাস আগে একদিন ফোনে মাকে বলেছিল— 'কাজ নেই, কাজ নেই বলছ, ফাঁকা লাগে, তো একটা কাজ কর না, আমাদের একটা ভাই বা বোন নিয়ে এস।'

মা হেসে বলেছিল— 'মন্দ বলিসনি। তাহলে আনি, কি বল?' তারপর আর একটু হেসে বলেছিল— 'কিন্তু তুই যা হিংসুটি!'

নিজেরই অজান্তে ঠোঁট নড়ছিল সৌমির। ... প্রমিস, মাম্মি, প্রমিস। আমি হিংসে করব না।... শুধু তুমি ফিরে এস।...

এয়ারপোর্টে পৌঁছে নীলকান্ত গাড়ি পার্কিংয়ে নিয়ে চলে গেল। ওরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল।

মোটামুটি ভিড়। তবে বসার জায়গা আছে। কিছুক্ষণ বসে সৌমি উঠে পড়ল। ভালো লাগছে না, অস্থির লাগছে।

বাপি জিজ্ঞেস করল— 'কিছু খাবি? খিদে পেয়েছে?'

শুকনো মুখে মাথা নাড়ল সৌমি। — না, ইচ্ছে করছে না।

পরের পর ফ্লাইট আসছে, যাচ্ছে। একদল এসে নামছে, আরেক দল ওড়ার তোড়জোড় করছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল সৌমি। পরশু সে নিজেই এসে নেমেছিল ব্যাঙ্গালোর-কলকাতার ফ্লাইট থেকে। এই প্রথম মা ওকে নিতে আসেনি।

পরের পর যাত্রীরা এসে পৌঁছচ্ছে। এ এক অদ্ভুত মিলনদৃশ্য। মা জড়িয়ে ধরছে মেয়েকে, মেয়ে মাকে, বন্ধু বন্ধুকে, পরিজনেরা পরিজনকে।

ঘড়ি দেখল সৌমি। ন'টা বেজে গিয়েছে। আর ঘন্টাখানেকও সময় নেই। দাদা এসে নামবে। ওর প্লেন মুম্বাই

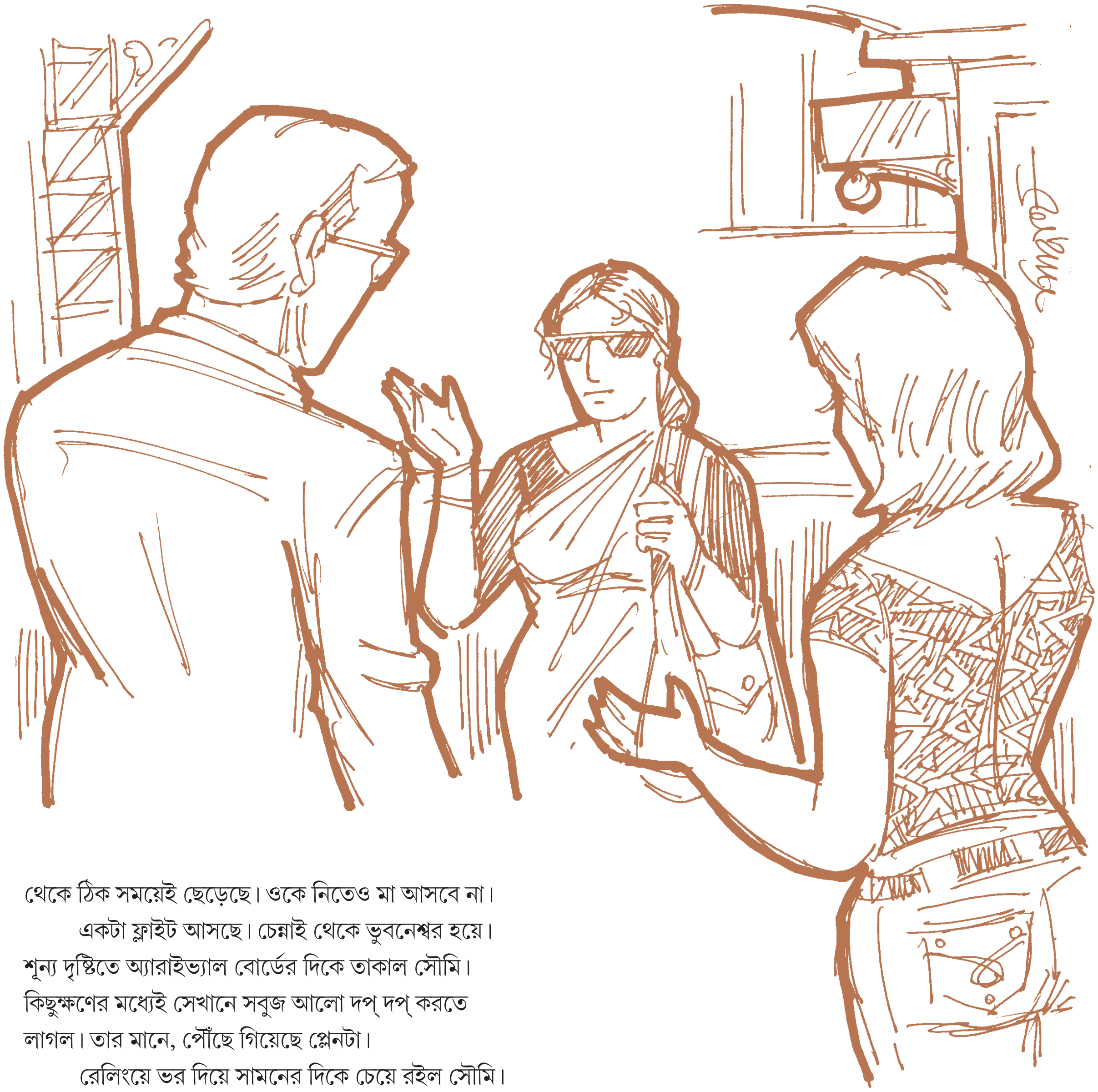

থেকে ঠিক সময়েই ছেড়েছে। ওকে নিতেও মা আসবে না।

একটা ফ্লাইট আসছে। চেন্নাই থেকে ভুবনেশ্বর হয়ে। শূন্য দৃষ্টিতে অ্যারাইভ্যাল বোর্ডের দিকে তাকাল সৌমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে সবুজ আলো দপ্ দপ্ করতে লাগল। তার মানে, পৌঁছে গিয়েছে প্লেনটা।

রেলিংয়ে ভর দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল সৌমি। চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে যাত্রীরা। মালপত্র নেবার জন্য চলে যাচ্ছে কনভেয়ার বেল্টের দিকে।

হঠাৎই চমকে উঠল সৌমি। হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছ এসে ধক্‌ধক্ করতে লাগল।

এই শাড়ি, এই চলার ধরন ওর খুব চেনা। চেনা কাঁধের ব্যাগ, আর হাতের মাঝারি মাপের ট্রলি— সুটকেসটাও।

পায়ের দিকে তাকাল সৌমি। ... চক্‌চক করছে বেল্টবাঁধা লাল রঙের লেডিস সু...

না, কোনও ভুল নেই। ভুল হতেই পারে না।

অন্ধের মতোই দৌড়তে শুরু করল সৌমি। দু-চারজনকে ধাক্কা মেরে কুবাক্য শুনে। হাত নাড়তে লাগল পাগলের মতো। শুধু চিৎকার করতে লজ্জা করছিল। সব মিলে গেলেও যদি ভুল হয়?

না, ভুল হয়নি।

দাঁড়িয়ে পড়েছে সেও। পাল্টা হাত নাড়ছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

— 'মা, মা, মা!' ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সৌমি। জড়িয়ে ধরেছে কাবেরীকে। কাবেরীও জড়িয়ে ধরেছে মেয়েকে।— 'কোথায় ছিলে বলো আমাদের ছেড়ে?'

মেয়েকে চুমো খেল কাবেরী। তারপর বলল— 'পাগলামি করিস না, তোর বাপি কোথায়? আমাকে নিয়ে চল।'

মার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সৌমি। চেয়ারে ঘাড় গুঁজে বসে ছিল সঞ্জীব। সামনে যাকে দেখল, তাকে তার

চোখ বিশ্বাস করতে পারল না।

তবে গলার স্বরে চিনল— 'মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সকালের ওষুধটা খাওনি?'

অজান্তেই জিভ কাটল সঞ্জীব।

হতাশভাবে মাথা নাড়ল রিংকি। বলল— 'হুঃ! ক'দিন ছিলাম না, সব গণ্ডগোল।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর এক ভদ্রমহিলা মার পাশে এসে দাঁড়ালেন। সৌমি দেখল, প্রায় মায়েরই সমান লম্বা, পাঁচ-তিন বা চার, তবে মায়ের মতো দোহারা গড়ন নয়, বরং একটু ভারির দিকে।

মহিলা বললেন— 'বাব্বাঃ। মেয়ের হাত ধরে কি ছুট! আমি খুঁজেই পাই না আর।'

সৌমি দেখল, মার ঠোঁটে লাজুক হাসি। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল— 'সোহিনি আমার ছোটবেলার বন্ধু। স্যোসাল ওয়ার্কার।'

ভদ্রমহিলা হাত তুলে বাপিকে নমস্কার করে বললেন— 'নিন মশাই, আপনার বউ। দয়া করে আর থানা-পুলিশ করবেন না। আমার সঙ্গেই হাওয়া হয়েছিল। বেশি দূর নয়, পুরী।'

পুরী শব্দটা ঘট্ করে কানে বাজল সঞ্জীবের।

তার মানে, ছোটমাসি ঠিকই দেখেছিল।

কাবেরীর মুখের দিকে তাকাল সঞ্জীব। দেখল, ওর হালকা লিপস্টিক দেওয়া পাতলা ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা। সঞ্জীবের মনে হল, এই হাসির রহস্য কাবেরীর নিজস্ব। এর নিজের ইচ্ছে না হলে এই রহস্যের উন্মোচন হবে না।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলল সঞ্জীব।

সোহিনি বলল— 'ব্যস্! এবার আমার ছুটি। টা-টা।'

কাবেরী বলল—'আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করে যা না।'

— 'আজ আর নয় রে। ক'দিন তোর পাল্লায় পড়ে অনেক কাজ জমে গিয়েছে আমার। যাব একদিন তোর উত্তরপাড়ার বাড়িতে। তোর সঙ্গে কথাও আছে আমার।'

সৌমির গাল টিপে আদর করল সোহিনি। বলল— 'মার শরীরের খোঁজখবর রাখবি। ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করে যেন।'

সোহিনি চলে যাবার কিছু পরে এসে নামল বাপ্পা। মাকে দেখে তারও চোখে বিস্ময়!

চারজনে একসঙ্গে ফিরছে গাড়িতে, সৌমি জিজ্ঞেস করল— 'মা, তুমি ফ্লাইট ধরলে কোথা থেকে?'

কাবেরী বলল— 'আমার আর এক পুরনো বন্ধু আছে। জয়। দাদার মেসেজ পেয়ে ওকেই ধরেছিলাম। যেভাবেই হোক আমাকে ফ্লাইটের টিকিট যোগাড় করে দাও। জয় ভুবনেশ্বর থেকে টিকিট করে দিল আমাদের।'

— 'তোমরা কি একসঙ্গে পুরীতে ছিলে?'

কাবেরী চোখ তুলে তাকাল মেয়ের দিকে। তারপর বলল— 'হ্যাঁ, ছিলাম।'

সামনের সিট থেকে সঞ্জীব বলল— 'ফ্লাইট মানে তো অনেক টাকার ব্যাপার। অত টাকা ছিল তোমাদের সঙ্গে?'

— 'পাগল! সব জয় করে দিয়েছে। আমরা বলেছিলাম, ফিরে এসে ওর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেব। কিন্তু ও নেবে না বলেছে।'

সৌমির চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। সে মার আরও একটু কাছে ঘেঁষে বলল— 'কিন্তু, তুমি কিছু না বলে চলে গেলে কেন?'

কাবেরী একটু হাসল। বলল— 'ইচ্ছে হল, একটু দুষ্টুমি করি। ... তোরা করিস না?'

... বলতে বলতে সোহিনির কথা মনে পড়ল কাবেরীর। প্লেনে আসতে আসতে ও বলেছিল— 'তুই যা করলি! পরেরটা দেখিস, খুব দুষ্টু হবে।'

কাবেরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তবুও হেসে বলেছিল— 'হলে হোক না।'

— 'হ্যাঁ রে, কি নাম দিবি?'

কাবেরী একটু ভেবে বলেছিল— 'জয়! মানে আনন্দ! যদি ছেলে হয় তবে আনন্দ, আর মেয়ে হলে আনন্দী।'

— 'আমার বুড়ো-বাচ্চা-প্রতিবন্ধীদের তো ভাগ নিবি। তোর আনন্দ বা আনন্দীকে আমাকে দে না।'

কাবেরী হেসে মাথা নেড়ে বলেছিল— 'উঁহু! আমি সব নেব। কাউকে ভাগ দেব না।'

বন্ধুর হাতে আলতো একটা চিমটি কেটেছিল সোহিনি। বলেছিল — 'তুই খুব পাজি! খুব দুষ্টু।'

মাকে জড়িয়ে ধরল সৌমি। বলল— 'আর দুষ্টুমি করবে না, বলো? ... প্রমিস? যাই ঘটুক, আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না?'

মেয়ের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল কাবেরী। তারপর হঠাৎই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বলল— 'নীলকান্ত, গাড়িটা গ্যারাজ করেই তুমি একবার মোতিয়াকে খবর দেবে। ক'দিন ছিলাম না, ঘরদোরের কি ছিরি হয়েছে, বুঝতেই পারছি। একটু সাফসুতরো করতে হবে।... আর হ্যাঁ, বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস এনে দেবে। আমি রান্না করব। তোমরাও খেয়ে যাবে।... কি বললাম, শুনলে?

এক নায়িকার কথা

রমানাথ রায়

একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল। আমাকে কেউ বড় একটা ফোন করে না। তাই একটু অবাক হয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে কানে চেপে ধরলাম।

— হ্যালো...

— কে? গোপাল? — এক মহিলার গলা।

— না, আমি গোপাল নই। আমি রবীন।

— তাহলে ভুল হয়ে গেছে। আসলে বয়স হয়েছে। নাম্বারগুলো ঠিকমতো মনে রাখতে পারি না।

— আপনার কত বয়স হয়েছে?

— সত্তর।

— আমার বয়স বাহাত্তর।

— তাহলে আপনি আমার থেকে মাত্র দু'বছরের বড়। আপনি কী করেন?

— কিছু করি না।

— আপনার স্ত্রী কোথায়?

— মারা গেছে।

— ছেলেমেয়েরা কি কাছে থাকে?

— না।

— আপনি একা থাকেন?

— হ্যাঁ।

— তাহলে তো আমার মতো অবস্থা।

— না, আপনার মতো অবস্থা নয়, আপনার তো গোপাল আছে। আমার যে তাও নেই।

— গোপাল আমার নাতির নাম। সে কোনওদিন আমাকে ফোন করে না। আমিই মাঝে মাঝে করি। কোনওদিন সে কথা বলে, কোনওদিন বলে না। শুধু বলে, ব্যস্ত আছি। পরে ফোন করো। আসলে একা থাকতে ভালো লাগে না। তাই কারও সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলব?

— আপনি আমার ফোনের নম্বরটা রেখে দিন। যখন মনে হবে তখন ফোন করবেন। আমার খুব ভাল লাগবে।

— আপনিও আমার নম্বরটা রেখে দিন। যখন ইচ্ছে হবে ফোন করবেন।

— করব।— বলে ফোনের লাইন কেটে দিলাম। দিয়ে হঠাৎ মনে হল আরে! আমার নামটা তো বললাম, কিন্তু ওঁর নামটা তো জানা হল না। জানার কি দরকার আছে? তা অবশ্যই নেই। তবু জানতে তো ক্ষতি নেই। আছে? না, কোনও ক্ষতি নেই। তাহলে নামটা জেনে নিই। মহিলা রাগ করবেন না তো? না, রাগ করবেন না। কারণ, এতে রাগের কী আছে!

আমি ওই নম্বরে ফোন করলাম।

মহিলার গলা ভেসে এল, হ্যালো...

বললাম, আপনার নামটা জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি বলবেন?

— আমার নাম কনক মিত্র।

আমি চমকে উঠলাম, কনক মিত্র!

— হ্যাঁ। কনক মিত্র। মনে হচ্ছে আমার নাম শুনে অবাক হয়েছেন।

— তা একটু হয়েছি।

— কেন?

— সে অনেক কথা। তা আপনার না শোনাই ভাল।

— তাহলে বলবেন না।

— রাগ করবেন না। পরে সময় হলে বলব।

— ঠিক আছে। পরেই বলবেন। না বললেও কিছু মনে করব না। আপনি ভাল থাকুন।

— আপনিও ভাল থাকুন।

কনক, আমার প্রথম যৌবনের কনক। আমার স্বপ্নের কনক। তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। সেই সময় সিনেমায় সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা কনক মিত্র। লোকের মুখে মুখে ফিরত কনক মিত্রর নাম। কনক মিত্রর সিনেমা রিলিজ করলে লোকে সিনেমা হলে ভিড় করত। টিকিট কাটার লম্বা লাইন পড়ত। আমিও লাইন দিতাম। সিনেমা হলে ঢুকে বুঁদ হয়ে বসে থাকতাম। সিনেমার পর্দায় কনক মিত্রর চলা-বলা-হাসি-চাহনি সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত। হল থেকে বেরিয়েও সে আচ্ছন্নতা কাটত না। আমার বন্ধুরাও ছিল কনক মিত্রর একান্ত অনুরাগী। আমরা পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে চায়ের দোকানে, কলেজ ক্যান্টিনে সবসময় কনক মিত্রকে নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা তখন গোগ্রাসে সিনেমার পত্রিকা পড়তাম। কনক মিত্রকে নিয়ে সেখানে নানা আলোচনা থাকত। আমরা সেখান থেকেই জানতে পারতাম কনক মিত্র কোন সাবান মাখেন, কোন তেল ব্যবহার করেন, কোন টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজেন, কোন কোম্পানির গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ান। আমাদের সব ঠোঁটস্থ ছিল। কিন্তু সেই কনক মিত্র একদিন এক প্রযোজকের পাল্লায় পড়লেন। তখন তাঁকে নিয়ে নানা মুখোরোচক গল্প চালু হয়ে গেল। তারপর একদিন কনক মিত্রর বিয়ে হল। সেই প্রযোজকের সঙ্গেই হল। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর সিনেমায় নামা বন্ধ হল। কেন বন্ধ হল তা আমরা জানি না। তিনি আস্তে আস্তে হারিয়ে গেলেন। নতুন নতুন নায়িকারা একে একে সিনেমায় আসতে লাগল। দর্শকরা তাদের নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ল। কনক মিত্র হারিয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, সমালোচকরা এবার সিনেমার আলোচনায় কনক মিত্রর অভিনয়ের নানা দোষক্রটি দেখাতে লাগল। কনক মিত্র হয়ে গেলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ অভিনেত্রী। আমার বন্ধুরাও একসময় কনক মিত্রকে ভুলে গেল। তারা এবার নতুন নতুন নায়িকাদের সিনেমা দেখতে লাগল, তাদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আমি কিন্তু কনক মিত্রকে ভুললাম না। আমার মনে কনক মিত্র গাঁথা হয়ে রইল। আজও গাঁথা হয়ে আছে। আজও কনক মিত্রকে ভুলিনি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নের নায়িকাকে ভোলা যায় না। এখনও এই বয়সে স্বপ্নের মধ্যে কনক মিত্র মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়। আর সেই জন্য আমি দোকান থেকে কনক মিত্রর অভিনয় করা কয়েকটা সিডিও কিনেছি। এসব সিডি আর চলে না। সব দোকানে পাওয়া যায় না। আমি ঘুরে ঘুরে কষ্ট করে জোগাড় করেছি। রাত্রিবেলা যখন ঘুম হয় না, তখন সেইসব সিডি চালাই, আমার ভালো লাগে। আমার মুগ্ধতা

আজও কাটেনি। তাই ফোনে কনক মিত্রর নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম।

কনক আমার প্রথম যৌবনের কনক। আমার স্বপ্নের কনক। আজ সেই কনক মিত্র ফিরে এলেন। সারাদিন প্রতি মুহূর্তে কনক মিত্র আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। আজকের সত্তর বছরের বৃদ্ধা কনক মিত্রর কী চেহারা হয়েছে জানি না। মাথার সবক'টা চুল নিশ্চয় সাদা হয়ে গেছে, দাঁতও নিশ্চয় পড়ে গেছে। গায়ের চামড়াও নিশ্চয় কুঁচকে গেছে। এখন হয়ত চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন। হাঁটতেও হয়ত ভাল করে পারেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। হয়ত লাঠি ব্যবহার করেন। জানি না, কিছু জানি না। কারণ আজকের মানুষ কনক মিত্রকে ভুলে গেছে। কেউ তার নাম জানে না। তাই তাঁকে নিয়ে খবরের কাগজে কিছু লেখা হয় না। টিভিতে কেউ তাঁর সাক্ষাৎকার নেয় না। এখন তিনি বিস্মৃত। এখন তিনি নিঃসঙ্গ। কেউ আর তাঁর কাছে আসে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। এমনকি নাতির কাছেও তাঁর কোনও মূল্য নেই।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছে হল কনক মিত্রকে ফোন করি। তাঁর সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু কি কথা বলব? অবশ্য কথা আমি বলতে পারি। পুরনো দিনের কথা। আমাদের সেই সময়ের স্বপ্নের কথা। বিশ্বাসের কথা, আমাদের ভালোলাগার কথা। কিন্তু কনক মিত্র সেসব কথা কীভাবে নেবেন? ভালোভাবে নেবেন কি? কারণ, তাঁর অতীত যেমন সুখের, তেমনই দুঃখের। বিয়েটা তাঁর জীবনে সুখের হয়নি। বিয়ে না করলে হয়ত তিনি আরও অনেকদিন অভিনয় করতে পারতেন। বিয়ে করেই সব গোলমাল হয়ে গেল। শুনেছিলাম, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে আর অভিনয় করতে দিতে রাজি হয়নি। তাঁর পক্ষে তখন এর প্রতিবাদ করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে আস্তে আস্তে তিনি হারিয়ে গেলেন। জানি না, এর জন্য কনক মিত্রর মধ্যে কোনও দুঃখ আছে কিনা। কিংবা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের উপর কোনও রাগ আছে কিনা। এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু তিনি কি এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন? না, দরকার নেই। আজ আর এসব প্রশ্নের দরকার নেই। এসব প্রশ্ন করলে কনক মিত্র হয়ত বিরক্ত হবেন, খুব রেগে যাবেন। তার চেয়ে ফোন করে কুশল বিনিময় করা ভাল।

হ্যাঁ, আমিই ফোন করব। আজ নয়, আরও ক'দিন যাক।

With Best Compliments:-

Anderson Wright International

With Best Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

With Best Compliments:

P. C. CHANDRA™
J E W E L L E R S

A jewel of jewels

Kolkata Showroom : Bowbazar : 2227-7272, **Global -** 2226-3700, **Gariahat :** 2461-8680, **Chowringhee :** 2223-8062, **Golpark :** 2464-5304, **Ultadanga :** 2355-4747, **Barasat** : 2584-3093, **West Bangal Showrooms : Asansol :**(0341) 2274-331, **Siliguri :** (0353)-2532194, **Malda :** (03512) 256558, **Burdwan :** (0342) 2569652, **Midnapore** : (03222) 261996, **Berhampore :** (03482) 259066, **Coochbehar :** (03582) 228301, **Serampore :** 2652-6413/14, **Other States Show-rooms : Dehli :** (011) 40616364 / 26270034 / 26270002, **Bengaluru** (080) 560042, **Bhubaneshwar :** (0674) 2380-887/88, **Agartala :** (0381) 2326666,
Exclusive GOLDLITES Showroom at Serampore : 2652-6413/14,

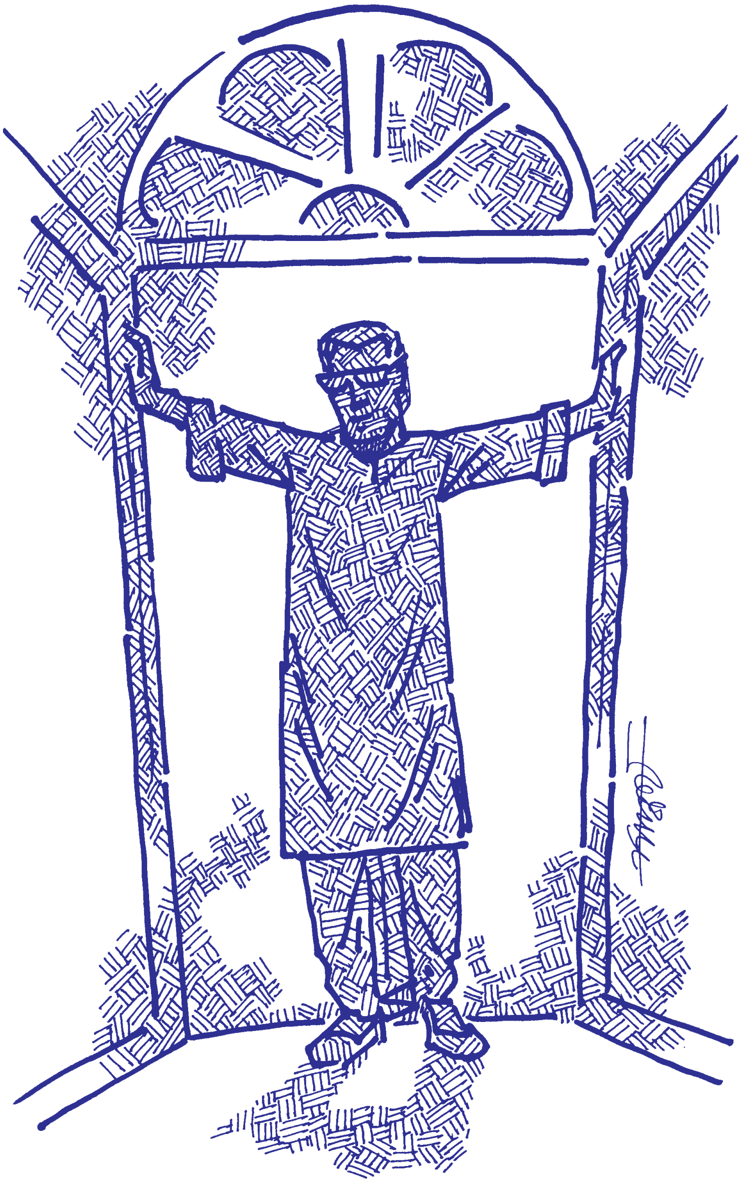

আমাকে ফোন করতে হল না। একদিন পরে কনক মিত্রই আমাকে ফোন করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম ‘কেমন আছেন?

— ভাল নেই। একা একা আর ভাল লাগে না। খুব কষ্ট হয়। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরাও দেখা করতে আসে না। ফোন করলেও কেউ বেশিক্ষণ কথা বলে না। একটা দুটো কথা বলেই লাইন কেটে দেয়। মাঝে মাঝে ভাবি, এরকম কেন হল। অথচ একসময়....

— আমি জানি সব। আমি আপনার একজন অনুরাগী।

— আপনার কথা শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল। আমাকে কেউ মনে রাখেনি। আপনিই শুধু মনে রেখেছেন। আজ সকালে কেন জানিনা, আপনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। আমি তাই আপনাকে ফোন করলাম। আপনি বিরক্ত হননি তো?

— ছিঃ ছিঃ, বিরক্ত হব কেন? আমিই আপনাকে কাল বা পরশু ফোন করতাম। তার আগে আপনিই ফোন করলেন। ভালই হল। ইচ্ছে আছে আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করব। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে....

— আপত্তি নেই। তবে দেখা না করাই ভাল।

— কেন?

— এখন আমি বুড়িয়ে গেছি। এখন আমি আর সেই কনক মিত্র নেই। আমাকে দেখলে আপনার আর ভাল লাগবে না। সেটা আমি চাই না। তার চেয়ে আমার যে ছবি আপনার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে সেটাই অক্ষয় হয়ে থাক।

— আপনার যদি ওই ইচ্ছে হয় তাহলে তাই হবে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব না। ফোনেই আমাদের কথা হবে। আপনি কথা বলবেন, আমি শুনব। আমি কথা বলব, আপনি শুনবেন।

— কিন্তু আমার যে কথা বলার কিছু নেই। সব শেষ।

— সে তো আমারও কথা বলার কিছু নেই। সব শেষ।

— তাহলে আমরা কী নিয়ে কথা বলব?

— রাজনীতি ছাড়া যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলব।

— রাজনীতি নয় কেন?

—আমি আজকেও রাজনীতির মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। তাই রাজনীতি নিয়ে কথা না বলাই ভাল। আমরা বরং সিনেমা নিয়ে কথা বলব।

কনক মিত্র একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি সিনেমা দেখি না। সিনেমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

— তাহলে ভগবান নিয়ে কথা বলব।

এবার কনক মিত্র হেসে ফেললেন। আমি তাঁর হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, ভগবান নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। ভগবানের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি চুপ করে যাই।

— তাহলে কী নিয়ে কথা বলব? বাজারদর নিয়ে?

— বেশ, তাই নিয়ে আলোচনা হবে। আপনি আলুর দর বলবেন, আমি পটলের দর বলব। আপনি চিনির দর বলবেন, আমি তেলের দর বলব। আর এইভাবেই আমাদের সময় কেটে যাবে। এটা ভাল হবে না?

বললাম— হ্যাঁ, তাই হবে।

কথাও একসময়ে ফুরিয়ে যায়। বলার মতো কথা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে তাই কথা হারিয়ে যায়। কী বলব ভেবে পাই না। মোবাইল কানে নিয়ে বসে থাকি। কনক মিত্রও দু-একটা কথা বলে চুপ করে যান। একদিন আমার কী মনে হল জানি না, হঠাৎ বলে ফেললাম, আমার একটা আফসোস থেকে গেল।

কনক মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, কী আফসোস?

— আপনাকে একবার চোখে দেখার ইচ্ছে ছিল। সেটা আর হল না।

— কী হবে আমাকে দেখে?

— একথা বলছেন কেন?

— আমি সত্তর বছরের এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা। আমাকে দেখার কিছু নেই।

— আমিও তো যুবক নই, আমিও বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ। আজ আছি, কাল হয়ত নেই। তাই মৃত্যুর আগে আপনাকে একবার সামনাসামনি দেখতে পেলে খুশি হতাম।

— তাহলে আসুন একদিন। কারণ আমার অবস্থাও ভাল নয়। আমার সারা শরীর জুড়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। কী কষ্ট যে পাই তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে হয়, আমি আর পারছি না।

— কী হয়েছে আপনার?

— কী হয়নি? হাজার রকমের অসুখ শরীরে বাসা বেঁধেছে।

— একথা এতদিন বলেননি কেন?

— বলতে চাইনি। তাই বলিনি।

— আমি তাহলে কালই আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন।

কনক মিত্র আমাকে তখন ফ্ল্যাটবাড়ির ঠিকানা দিলেন। সেই সঙ্গে বললেন, ফ্ল্যাটের দরজা খোলা থাকবে। আপনি সরাসরি ভিতরে চলে আসবেন।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA
Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

ফ্ল্যাটের দরজা খোলা থাকবে কেন?

কনক মিত্র বললেন— দু'দিন থেকে ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই থাকে। কারণ বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা আমার নেই।

সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। মাথার মধ্যে কনক মিত্রের শেষ কথাগুলো ঘুরতে লাগল। আর মনে হতে লাগল কাল ওঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাব তো? সেই সঙ্গে মনে পড়তে লাগল কনক মিত্রের বিখ্যাত সিনেমাগুলোর কথা। আমার চোখ ফেটে জল চলে এল।

পরদিন সকাল হতেই আমি কনক মিত্রের ফ্ল্যাটে ছুটলাম। ফ্ল্যাটের দরজা ওঁর কথামতো খোলা ছিল। আমি ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম, একটা ঘরে কনক মিত্র শুয়ে আছেন। কপালে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। বুঝলাম অনেক আগেই মারা গেছেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ।

কাগজটা হাতে নিলাম। তাতে লেখা : রবীনবাবু, আমার দেখা পেলেন তো? এবার নিশ্চয় খুশি?

সঙ্গে সঙ্গে কনক মিত্রর একটা সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল। সেখানেও ঠিক এরকম দৃশ্য ছিল।

With Best Compliments From

TANTIA
ISO 9001:2008

Tantia Constructions Ltd.

Major Civil Engineering Contractor for Road Works, Bridge & Flyovers, Housing Complexes, Industrial Structures, Railway Lines, Pile Foundation & Dykes.

Registered & Administrative Office

25-27, Netaji Subhas Road, 1st Floor,
Kolkata – 700 001
Phones : 033-2230-1896/6284 & 2230-7300,
Fax : 91-33-2230-7403
visit us at : www.tantiagroup.com

Corporate Office

DD-30, Salt Lake City, Sector-I
Kolkata - 700 064
Phone : +91 33 40190000, Fax : +91 33 40190001
e-mail : info@tantiagroup.com

Delhi office

708, 7th Floor, Ansal Bhawan
16, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place
New Delhi - 110 001
Phone : +91 11 4578-5890/91/92
Fax : +91 11 4578-5894
E-mail : delhi@tantiagroup.com

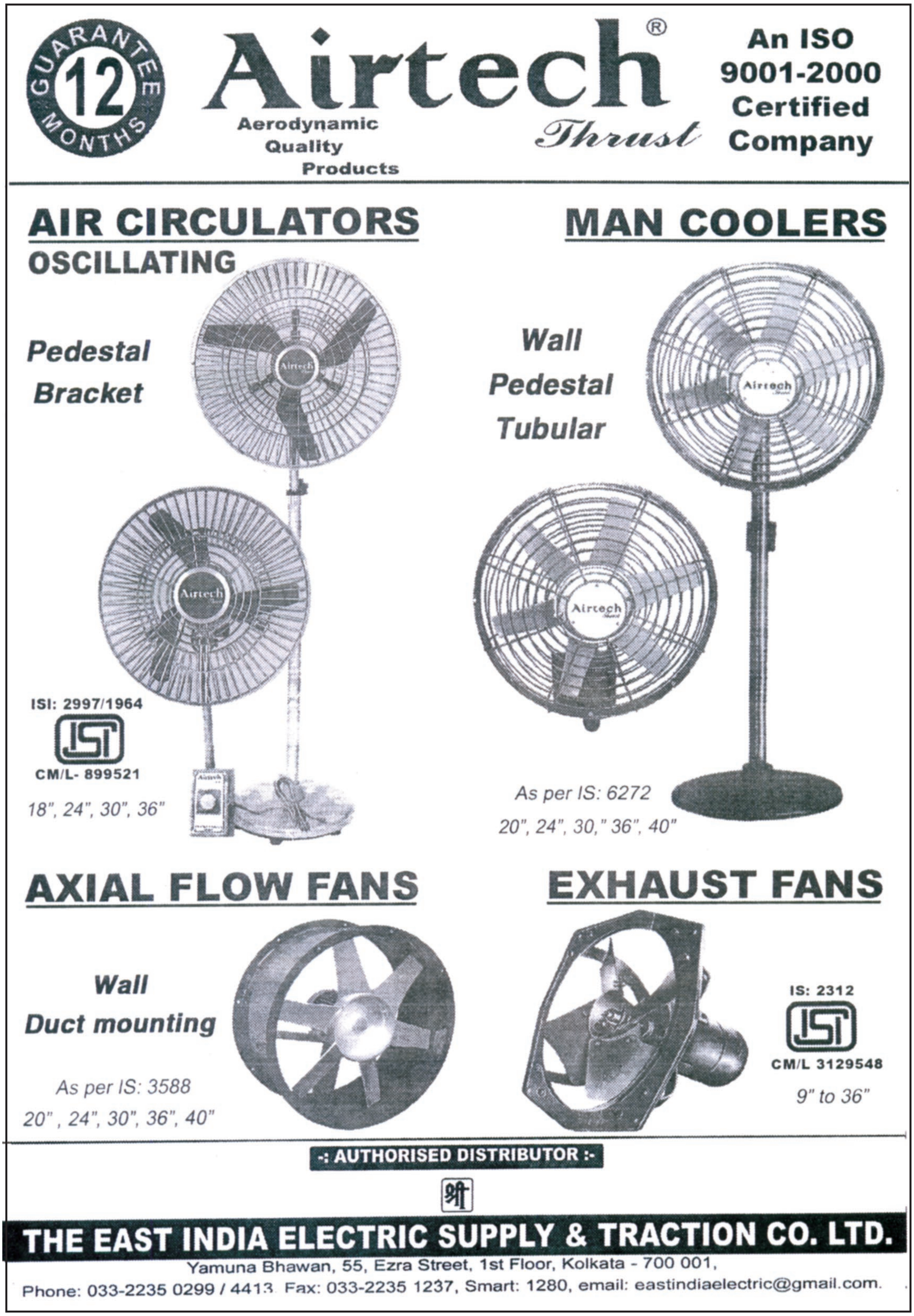
GUARANTEE 12 MONTHS
Airtech®
Aerodynamic
Quality
Products
Thrust
An ISO
9001-2000
Certified
Company
AIR CIRCULATORS
OSCILLATING
Pedestal
Bracket
ISI: 2997/1964
ISI
CM/L- 899521
18", 24", 30", 36"
MAN COOLERS
Wall
Pedestal
Tubular
As per IS: 6272
20", 24", 30," 36", 40"
AXIAL FLOW FANS
Wall
Duct mounting
As per IS: 3588
20" , 24", 30", 36", 40"
EXHAUST FANS
IS: 2312
ISI
CM/L 3129548
9" to 36"
-: AUTHORISED DISTRIBUTOR :-
श्री
THE EAST INDIA ELECTRIC SUPPLY & TRACTION CO. LTD.
Yamuna Bhawan, 55, Ezra Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001,
Phone: 033-2235 0299 / 4413 Fax: 033-2235 1237, Smart: 1280, email: eastindiaelectric@gmail.com.

লকেট

জিষ্ণু বসু

ওঠার আগেই মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়েছে প্যাসেঞ্জার, ‘তোমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারিটা কে?’

শুনেই মাথাটা দপ্ করে উঠেছে ধনার।

সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন দিনে কাজে বের হতে কার ভালো লাগে?

ধনা একটু ঝাঁঝালো গলাতেই বলল, 'যেই হোক না কেন, বৃষ্টি হলে পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে।' গলার ঝাঁঝে কাজ হল। লোকটা কথা না বাড়িয়ে উঠে বসল রিক্সায়।

স্টেশনের রিক্সা স্ট্যান্ডটা রাস্তা থেকে একটু নিচু। রিক্সা টেনে তুলতে একটু জোরই লাগে। ধনা রাস্তায় রিক্সা তুলে তবে সিটে উঠল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে ভাবল, একটু মিথ্যে কথাই বলা হলো। ইউনিয়নের শেষ মিটিং-এ কথা হয়েছিল বৃষ্টি বাদলা হলে দু'টাকা বেশি চাওয়া যাবে। ধনা সেটাকে বাড়িয়ে পাঁচটাকা করেছে। মিটিং-এ বারবার বিষ্ণুদা বলছিল, মানুষ যেন অখুশি না হয়। পরিবর্তনের আনন্দ যেন সবাই অনুভব করে। কিন্তু আজ ধনার কিছু করার নেই। আজ ভিটামিনের টনিকগুলো কিনে ফিরতেই হবে। কাল ডাক্তার কাকিমার বাড়ি থেকে ফিরে খুব কাঁদছিল টুম্পা। এইবার নিয়ে চারবার পোয়াতি হল বউ। কাকিমা বলছে, এবারটা একটু বেশি বয়সে, তাই একটু বেশি সাবধান হতে হবে। তার উপর টুম্পার যা হাড় জিরজিরে ফ্যাকাশে দশা, এবার বাচ্চা হতে গিয়ে খারাপ কিছু একটা না হয়ে যায়! বলেই কাঁদছিল টুম্পা। বৌয়ের কাছে সাধারণত মুখ ঝামটাই খেয়ে থাকে ধনা। বিশেষত রাতে এখন প্রায়দিনই বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে 'খাওয়া' হয়ে যাচ্ছে। যদিও মাল খেয়ে বাওয়াল খুব কমই করে সে। কিন্তু কোলে কাঁখে তিন তিনটে ছেলে নিয়ে জেরবার টুম্পা, এখন ধনাকে নেশা করতে দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কালকে তখনও ভালো মতই ধুনকি ছিল। বাড়ি ফিরে দেখল বড় ছোট দুটো আছে, বোতল আর পাঁইট। পাড়ার কালিতলার ছেলেরা ধনার তিন ছেলের নাম দিয়েছে বোতল, পাঁইট আর নিব। ঠাট্টা থেকে শুরু হয়ে নামগুলো এত ছড়িয়ে গেছে যে ধনাও অদের অন্য নামগুলো প্রায় ভুলেই গেছে। একটু পরেই টুম্পা ছোটটাকে কোলে নিয়ে ফিরল। ছেলের হাতে ছোট্টো ঠোঙায় গুড়ে কটকটি কিনে দিয়েছিল। ধনা ছোটো ছেলেটাকে আদর করতে যেতেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিল টুম্পা। এসবই ধনার চেনা ঘটনা। ও আশা করছিল, এরপরেই কড়াকড়া কথায় ওকে বিঁধতে শুরু করবে বউ। কিন্তু কাল টুম্পা ওসব কিছু করল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ধনা হকচকিয়ে গিয়েছিল। একটা কথাই ওর ঘুরে ফিরে কাল রাতে কানে বাজছিল, 'আমি মরে গেলেও তুমি ওসব ছাইপাঁশ খাবে না গো? তোমার পায়ে পড়ি গো বাচ্চাগুলোকে একটু দেখো, একেবারে রাস্তার শেয়াল কুকুরের মুখে ছেড়ে দিও না।'

আজ সকাল থেকেই ধনা ঠিক করে নিয়েছে ও মাল খাবে না। আজ ভালো করে খেটে রাতে বৌয়ের ওষুধগুলো নিয়ে ফিরবে। না হলে এমন দিনে ধনা স্ট্যান্ডে থাকে? বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির করে, সঙ্গে একটু বাদলা হাওয়াও আছে, বলাইয়ের চুল্লুর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণটা একেবারে আকুলি বিকুলি করছিল। ধ্যুৎ বিরক্ত লাগে। কি করে যে আবার হয়ে গেল! ধনার নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল।

আসলে গণ্ডগোলটা করেছে ধনার শাশুড়ি'মা। বিয়ের পর বছর দুয়েক ওদের কিছু হচ্ছিল না। আরে বাবা বুঝেশুনে নিতেও তো একটু সময় লাগে, নাকি? কিন্তু টুম্পার মার সবুর সইল না। ওদের ওখানে খুব জাগ্রত নাকি পাঁচু ঠাকুর। সেখানে ঢিল বাঁধলে নাকি পেট বাঁধবেই বাঁধবে। সত্যিই তাই হল। ছেলেকে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে ঢিল খুলেও এসেছিল ওরা প্রথমবারেই। কিন্তু ফেরার পথে টুম্পা বিড়বিড় করে বলেছিল, বোধহয় ঠিক ঢিলটা খোলা হয়নি। তাই পরের দু'বার ধনা বৌয়ের উপর ভরসা না করে নিজেই টুম্পার দেখানো গাছের ডাল থেকে চার-পাঁচটা করে ঢিল খুলে এসেছে। কিন্তু কি আর হবে, অভাগীর মরণ। বাঁধার সময় তো একটা চিহ্ন রাখবি ঠিকঠাক।

কাল টুম্পার কান্নায় নেশার দফারফা। একটু ধাতস্থ হয়ে ওর বিচার- বুদ্ধি মতো বউয়ের কানে পেড়েওছিল কথাটা। কিন্তু টুম্পা কথাটা শুনে একেবারে ফোঁস করে ওঠে, 'বাপকেলে জমি দোকান সবই তো নষ্ট করেছ, এবার আমার পেটের দিকে নজর পড়েছে। ওই কথা আর একবার বললে অনাছিষ্টি করে ছাড়ব। আমি রক্তশূন্য হয়ে মরি আর যাই হোক তোমার পেপসি খাওয়া তো ঠিক থাকবে।' তারপর চোখের জল মুখে ছেলে কোলে তুলে বলল, 'তাছাড়া এবার মা লক্ষ্মী আসবে। আমার মন বলছে।' এবার অবশ্য ধনারও মন বলছে মেয়েই হবে। পোয়াতি হবার পর এত সুন্দর কখনও লাগেনি টুম্পাকে। দেশ গাঁয়ে সবাই বলে তাহলে নাকি মেয়েই হয়। সেদিন হাসপাতালে টিকিট করতে যাওয়ার সময় কালীতলার ছেলেছোকরারা আবার চ্যাংড়ামো করছিল, 'ধনাদা বোতল, পাঁইট, নিব্... তারপর কি গো, পেগ?' টুম্পা কট্‌মট্ করে তাকিয়েছিল একবার চ্যাংড়াগুলোর দিকে, তারপর মিনিটখানেক ধনাকে মেপেছে। ধনার কিন্তু মনে মনে ভালোই লাগছিল নামটা শুনে। সিনেমায় দেখা অমিতাভ বচ্চনের হাতের গোলগাল পেগের মতো সুন্দর টেঁপাটোঁপা একটা মেয়ে। ভালোই তো। কিন্তু বউটার যে কেন অ্যানিমিয়া হয়ে গেল?

এইসব ভাবতে ভাবতে অনেকটা এগিয়ে এসে পড়েছে ধনা। এবার খেয়াল হল, ওঠার সময় প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে খিঁচ করেছে। কাজটা ঠিক নয়। শত হোক খদ্দের হল আসল লক্ষ্মী। ও ভাব জমানোর জন্য কথাটা পাড়ল, 'দাদাভাই, সেক্রেটারির কথা কি যেন বলছিলেন? আপনি চেনেন নাকি?'

কোনও উত্তর আসে না। বৃষ্টির জন্য রিক্সার হুড তোলা, তার উপর সামনের পর্দাও ফেলা। তাই ধনা ঠিক ঠাওর করতে পারে না, লোকটা ক্ষেপে আছে না শুনতে পায়নি। ও এবার একটু জোরেই বলল, 'আমাদের সেক্রেটারি ওশিদ।

ওশিদ আলি বাগানি। কেন জিজ্ঞেস করছিলেন বড়দা?'

সওয়ারি এবার শুনতে পায়। আসলে ও কথাটা একটু চমকানোর জন্যই হয়তো বলেছিল। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েই বলল, 'ওই আগে একজনকে চিনতাম আর কি। এখন কারোকে...'

ধনা খুব উৎসাহিত, 'কে বড়দা, নামটা কি?'

লোকটা যেন আরও বিপাকে পড়ে। পরিবর্তনের পরে লাল সবুজের গেরোয় কার নাম বলে কি বিপত্তি হবে! তবু বলেই ফেলল, 'ওই বনমালীবাবু, বনমালী সরকার।'

ধনা একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'ওঃ! বনমালীকাকা! হ্যাঁ, সে তো আপনাদের বিশালক্ষ্মী তলাতেই থাকে। তা সে বনমালীকাকা তো অনেকদিন আগেই হাওয়া হয়ে গেছিল। সে রামও নেই, আর রাজত্বও নেই।'

বনমালীকাকারা অনেকদিনই ইউনিয়নের ধারেকাছে ছিল না। বনমালীকাকা, ব্রজেনদা— এইসব বোতলের পেছনের মতো মোটা কাঁচের চশমা পরা, কথায় কথায় বাহাত্তর, খাদ্য আন্দোলন... এইসব বলা বুড়ো হাবড়াদের বহুদিন আগেই লালপার্টির লোকেরাই সরিয়ে দিয়েছিল। তার জায়গায় স্থান করে নিয়েছিল ঝনাই, পল্টনদারা। পল্টনদাই শেষদিকে প্রায় দশবছর সেক্রেটারি ছিল। স্টেশন রোডের উপরেই দুটো দোকান। প্রয়োজনে যখন তখন বললেই বাইক চালিয়ে এসে হাজির হত। গলায় মোটা সোনার চেন, গম্ভীর গলা, দেখলেই ভক্তি হয়। শেষের দিকে কেউ যেত না বনমালীকাকাদের প্যানপ্যানানি শুনতে।

ধনা এত কিছু বলল না। ও শুধু বলল, 'তাছাড়া এখনকার ছিসটেম তো আলাদা। লালবাবুদের কমিটিতে মাথায় থাকত সেক্রেটারি, রিক্সাওয়ালারা কেউ সেটা হত না। বাইরের কোনও লেখাপড়া করা বাবু হত সেক্রেটারি, আমরা কেউ তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতাম।' লোকটা মন দিয়ে শুনছে দেখে ধনা বলে চলল, 'আর এখনকার দলের সবচেয়ে ওপরে হল প্রেসিডেন। আর আমাদের থেকে কেউ সেক্রেটারি হবে। আরে আমারই তো সেক্রেটারি হবার কথা ছিল...'। বলেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিক্সাচালক। বৃষ্টি একটু যেন ধরে এসেছে, সওয়ারি লোকটিও একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েই যেন রিক্সার সামনের পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল। আগ্রহ ভরেই বলল, 'তোমার সেক্রেটারি হবার কথা ছিল? তারপর কেন হলে না?'

ধনা রিক্সার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, 'ছেড়ে দিন বড়দা, সেসব শুনে কি হবে?'

লোকটির কৌতূহল বাড়ছে। আরও অনেকটা পথ। কেসটা না জেনে বাড়ি গেলে বোধহয় রাত্রে ভাত হজম হবে না। একটু ফাঁক দিয়ে লোকটি আবার প্রশ্ন করল, 'কি গো, কেন সেক্রেটারি হলে না বললে না?'

আরও একটু চুপ করে থাকে ধনা। যেন আবার একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। 'সে একটা লকেটের জন্য।' আবার চুপ রিক্সা এগিয়ে চলেছে। পুরাতন বাজার ছাড়িয়ে থানার পুকুরের দিকে যাচ্ছে রিক্সা। মিনিটখানেক থেমে অধৈর্য্য সওয়ারি বলে ওঠে, 'লকেটের জন্য মানে?'

'আসলে আমি তো আগের কমিটির এক্জিকিউটি ছিলাম। টানা ন'বছর।' ধনা বলতে থাকে।

'ওঃ! তাই বল, তা তুমি আগের পার্টির সমর্থক ছিলে, তবে এখন আবার সেক্রেটারি হবে কিভাবে?'

এবার যেন একটু রেগে যায় ধনা, 'কিভাবে মানে? সবাই তো তাই হয়েছে। পাঁচ বছর আগে সিপিএম ছাড়া আর কিছু ছিল নাকি? এই যে আমাদের প্রেসিডেন, বিষ্ণুদা, বিজিপি পার্টিতে ছিল।'

'সেকি! তুমি জানলে কি করে?'

'তখন তো লালপার্টির মিছিল বের হলে আমাদের শেখানো থাকত, বিষ্ণু চক্কোত্তির বাড়ি সামনে এলেই স্লোগান দেওয়া— সামপোতিক সম্পিতি ভাঙতে দিচ্ছি না, দেব না।'

লোকটি একটু অবাক হয়ে বলে, 'সাম্প্রতিক সম্প্রীতিটা কি?'

ধনা খুব প্রত্যয় নিয়ে বলে, 'আরে জানেন না! এই হিন্দু-মোছলমানের মধ্যে যে ভালোবাসাবাসি, তাকেই বলে সামপোতিক সম্পিতি।'

এবার পরিষ্কার হয়, 'ওঃ আচ্ছা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বোঝা গেল। কিন্তু সবাই যখন অন্য পার্টি থেকে এসেছে, তোমাকেও তো ক্ষমা করে নিতে পারত।'

এবার একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল ধনা, 'কারো ক্ষমা-টমা চাই না। আমি তো আসলে জাতে কংগ্রেস। বারুইপুর মিনিসপ্যালিটির যে চেয়ারম্যান ছিল না, নিকুঞ্জ বিহারী দাস, আমার বাবা তাঁর রিক্সা চালাতো। খুব ভালো লোক ছিল নিকুঞ্জদাদু। বাবাকে একটা নতুন রিক্সা কিনে দিয়েছিল।'

একটু যেন দম নেয় ধনা, 'এবারও তো আমিই রিক্সাস্ট্যাণ্ডে পরিবর্তন আনলাম। ভোট হবার পর, গোনার আগে যে দশ-বারো দিন ছিল, তখনই তো আমি সব জোগাড়পাতি করলাম। আমার মন বলছিল, এবার পাল্টাবে। তাই স্ট্যান্ডের সবাইকে রাজি করিয়ে, আমাদের ওয়ার্ডের কমিশনারের বাড়ি থেকে রাতারাতি তিনরঙা পতাকা এনে, রিক্সাস্ট্যান্ড সাজিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে একান্নটা গাড়িতে আমি পতাকা বেঁধেছি। রেজাল বেরোনোর পর পল্টনদার বাড়ির দিকে তাক করে দু-দুটো মাইকের চোঙ লাগিয়ে টানা বাহাত্তর ঘন্টা রবিন্দো সঙ্গীত বাজানো হয়েছিল। সবই আমার প্যালান।'

ধনার কথার মধ্যে একটা তেজ এসে গেছে। 'এমনকি স্ট্যাণ্ডের শনি মন্দিরের আদ্ধেকটা ভেঙ্গে যে নামাজঘর করা হয়েছে সেটাও আমি দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছি।'

সিটে বসা লোকটি বিষয়টা ঠিক ঠাওর করতে পারে না, 'কেন মন্দির ভেঙ্গে দিলে কেন? ওই শনি মন্দির তো আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি।'

'না- না। পুরোটা ভেঙ্গে দেওয়া

হয়নি। জেলার নেতারা এসে বলে গেল, সংখ্যালঘুদের একটা জায়গা করে দিতে হবে। ওটাই ছিল প্রথম শর্ত।'

'কিন্তু তোমাদের এখানে কি নমাজ পড়ার লোক আছে? হিন্দুই তো বেশি।'

ধনা বেশ বিজ্ঞের মতো বলে, 'বাঃ! আছে না? আমাদের এই স্ট্যান্ডে মেম্বার আছে ছেষট্টি জন, তার মধ্যে পাঁচজন সংখ্যালঘু। বললাম না আমাদের সেক্রেটারি হয়েছে ওই ওশিদ বাগানী।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে। আবার ধনাই শুরু করে, 'আর তাছাড়া আমাদের হিন্দুদের কে ওইসব ধম্মোটম্মো নিয়ে কচলাচ্ছে বলুন তো? কেউ প্রসাদ দিলো, একটু মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে নাও, ব্যাস।'

বিশালক্ষ্মী মন্দির ছাড়িয়ে গেছে। লোকটি পথনির্দেশ করে, 'ওই শিবের রকের পাশ দিয়ে ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, কি বলছিলে তুমি, পরিবর্তনের জন্য এত কিছু করলে, আর তোমাকেই পাত্তা দিল না?'

রিক্সার রাবারের হর্ন দু'বার পক্‌পক্ করে বাজিয়ে বাঁ দিকে গলিতে ঢোকায় ধনা।

'মিথ্যা বলব না। পাত্তা ঠিকই দিচ্ছিল। প্রথম মিটিংয়ের দিন একেবারে সামনেই বসেছিলাম আমি। কিন্তু তখনই, সেই লকেটে আমার কপাল পুড়ল।'

এর পরের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে করতে প্যাসেঞ্জারের বাড়ি এসে গেল। ঘটনাটা সত্যিই অভূতপূর্ব। বছর দশেক আগে রিক্সা স্ট্যাণ্ডের ইউনিয়ন থেকে কয়েকজনকে বেছে পাঁশকুড়ায় নিয়ে গেছিল আগের পার্টি। প্রায় পনের দিন ওদের স্ট্যাণ্ডের পাঁচজন দিনরাত ভোটের জন্য খেটেছিল। ধনা ওখানে গিয়ে মোটর লাগানো রিক্সাভ্যান চালানো শিখে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পার্টির কাজ করেছিল। সেবার দারুণ ভাবে ভোটে জিতে গেল পার্টি। তখন লোকাল কমিটি খুশি হয়ে ওদের পাঁচজনকে কিছু টাকা আর একটা করে রূপোর কাস্তে হাতুড়ি লকেট উপহার দিয়েছিল। বিগত বছরগুলোতে ধনা বেশ গর্বের সঙ্গে সেই লকেট পরে ঘুরেছে। পরিবর্তনের পরে মিটিঙের দিন নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সবুজ টুনিবাতি দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছিল রিক্সাস্ট্যাণ্ড। ধনাই ছিল মূল উদ্যোক্তা। স্নান-টান সেরে অনেক খুঁজে ট্রাঙ্ক থেকে বার করেছিল, পুরনো একটু ছিঁড়ে যাওয়া সবুজ গেঞ্জি। মিটিঙে একদম সামনের সারিতে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু খেয়ালই ছিল না কখন গেঞ্জির ভেতর থেকে কাস্তে হাতুড়ির লকেট বাইরে বের হয়ে গেছে। যখন খেয়াল হল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে ঠাট্টা, চিমটি কাটা। ধনার আর সেক্রেটারি হওয়া হল না। সেদিন রাতে রাগে দুঃখে তিন-তিনটে পাউচ্ প্যাকেট চুল্লু খেয়ে ফেলেছিল ধনা। তারপর রেল বাজারেই সারারাত শুয়ে কাটিয়েছে। পরদিন সকালে জ্ঞান হতেই এক টানে ছিঁড়ে ফেলেছে গলার এতদিনের পুরনো লকেট।

বাড়ি এসে গেছে। ভাড়া দিতে গিয়ে দেখা গেল খুচরো নেই। 'কি গো, তোমাকে তো পঁচিশ টাকা দিতে হবে। একশো টাকা খুরচো হবে?'

ধনা একটু ভাবল, 'হ্যাঁ, হয়ে যাবে বোধহয়। একটু দাঁড়ান। বৃষ্টির জলে ভিজে যাবে বলে সিটের তলায় রেখেছি।'

সওয়ারির হাত থেকে একশ টাকার নোটটা নিয়ে, ধনা বসার সিটটা সরিয়ে একটা কাপড়ের ব্যাগ বার করল। আলো আঁধারে টাকার পুঁটলি খুঁজতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল কাগজের একটা মোড়ক। একটা ধাতব শব্দ হল। ধনা শশব্যস্ত হয়ে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়েই একগাল হেসে ফেলল।

'এই যে বড়দা, এই সেই লকেট। সেদিনের পরে বাড়িতে তুলে রাখব, তুলে রাখব করে গাড়িতেই পড়ে আছে। বেশ ভারি আছে দাদা, প্রায় আটানা হবে।'

বাকি টাকা ফেরত দিয়ে রিক্সাটা ঘোরায় ধনা। প্যাডেলে পা দিয়ে উঠতে যাবে, কি ভেবে একটু দাঁড়াল। 'এখনই দোকানে গলাতে গেলে স্যাকরা কি বলবে, হয়তো হাসাহাসি করবে। ক'দিন পর লোকে সব ভুলে-টুলে গেলে নিয়ে যাব।'

এবার একেবারে কান এঁটো করা হাসি, 'আমার বৌয়ের এখন....।'

বলেই কান চুলকাতে থাকে সে, 'তিন ছেলের পর আমার মন বলছে মেয়েই হবে। ভাবছি এটা গলিয়ে মেয়ের হাতের কি পায়ের কিছু একটা গড়িয়ে দেব।'

□